একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা

কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান

অবসর

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা
এটি একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ।
এ গ্রন্থের বক্তব্য সম্পূর্ণই লেখকের নিজস্ব। এ বিষয়ে
প্রকাশকের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

প্রচ্ছদলিপি
দীপক রায়

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 286 - 0

71er Muktijudha : Akjan Sektor Comandarer Smrithikatha (autobiography)
by Retired Colonel Quazi Noor-Ujjaman
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : February 2009. Price : Taka 160.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

উৎসর্গ

সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা
দেশের অভ্যন্তরে, দেশের বাইরে
এবং আমার ছেলে নদিম ওমর
[মুক্তিযুদ্ধের শিকার]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা

১

নঈম জাহাঙ্গীর ২০০১ সালের ২ এপ্রিল সকাল ১০টার দিকে টেলিফোন করে তখনই আমার সাথে দেখা করতে চাইল। হঠাৎ তার এই আগ্রহ দেখে আমি খুব খুশি হলাম। বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ছিল। ১০ মিনিটের মধ্যে বাসায় এল নঈম।

সামান্য কথাবার্তার পরেই জিজ্ঞাসা করলাম হঠাৎ আমার সাথে দেখা করার কারণ। নঈমের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, তার চিন্তা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। নঈম জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে শুনলাম '৭১ সালের মুজিববাহিনীর সদস্যরা মহাসমারোহে সম্মেলনের মাধ্যমে মুজিববাহিনীর কীর্তিকলাপ জনগণের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই বিষয়টিকে নাকি প্রচার মাধ্যম লুফে নিয়েছে। নঈমের আপত্তি এই যে, এই সমাবেশে মুজিববাহিনী সম্পর্কে এমনি বক্তব্য রাখা হতে পারে যে, এদেশের লোকে মনে করবে, ওরা ব্যতীত আর কোনো মুক্তিযোদ্ধার কোনো অবদান নাই। তাদের প্রচেষ্টা এবং তাদেরই সচেষ্ট সংগ্রামে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। নঈম বিষণ্ন এ-কারণে যে, এর প্রতিবাদ না করলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যতে জনগণ কেবল মুজিববাহিনীর সদস্যদেরই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায় এক লক্ষ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা অপ্রধান থেকে যাবে। তার ইচ্ছা, এর জোর প্রতিবাদ করা হোক, একটি মিটিং আহ্বান করা হোক, যেখানে নামকরা মুক্তিযোদ্ধাদের আহ্বান করা হবে এবং তাদেরকে অনুরোধ করা হবে দেশের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য। আমার কাছে আসার কারণ আমাকে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে রাজি করা। তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। বুঝতে পারলাম সে কত গভীর মানসিক আঘাত পেয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এখনো কত প্রজ্বলিত। তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আলোচনাটা তখন বাস্তবতার দিকে মোড় নিল।

এরকম একটি মিটিং আহ্বান করা হলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা কোন ফোরাম থেকে কথা বলব, কোন কোন মুক্তিযোদ্ধাকে আহ্বান করা হবে, মিটিং কবে হবে, কোথায়

হবে, কখন হবে? আরো প্রশ্ন, এরকম একটি মিটিং ডাকা হলে আমাদের আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধারা কি সাড়া দেবে? প্রশ্নগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। উভয়েই প্রায় একমতে পৌঁছলাম যে কোনো কোনো নামকরা মুক্তিযোদ্ধা আমাদের ডাকে সাড়া দিতে ইতস্তত করতে পারে।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারা যায় দেশপ্রেমিক সশস্ত্র প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আজ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক শ্রেণী আজ প্রতিষ্ঠিত। তাদের মনে যাই থাকুক না কেন বাহ্যত তারা সমাজের সাথে এবং বর্তমান রাজনীতির ধারার সাথে সমঝোতা করে ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ত্যাগ করে তারা বৈষয়িকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সরকার বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করতে চায় না। আর অন্য শ্রেণী আজ অবহেলিত এবং মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট পাবার আশায় ভিখিরির মতো চলাফেরা করছে।

নঈম কিন্তু পীড়াপীড়ি করতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, হঠাৎ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ না ডেকে পাঁচ-দশজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলোচনায় বসে সমাবেশ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই ভালো হবে। নঈম রাজি হল এবং বলে গেল যে সে মাসের ৫/৬ তারিখের মধ্যেই তার বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলে আমার বাড়িতে একটি বৈঠক করবে। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

নঈম যে চিন্তাভাবনা করছে, চট্টগ্রামের ফারুকী আজমও একই কথা চিন্তা করছে। ফারুকী আজম সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। ফারুকী আমার সাথে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে গিয়েছে। ৮ এপ্রিল সে একটি আঞ্চলিক সমাবেশ ডেকেছে এবং সকল পার্টির মুক্তিযোদ্ধাদের আহ্বান জানিয়েছে এই সমাবেশে আসতে। নঈমকে পরামর্শ দিলাম সে যেন ফারুকী আজমের সাথে যোগাযোগ করে। ফারুকীর টেলিফোন নম্বরও তাকে দিলাম। যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নঈম চলে গেল।

আমি ২ এপ্রিল রাতে ফারুকীকে টেলিফোনের মাধ্যমে নঈমের পরিকল্পনার কথা বললাম। শুনে খুব খুশি হল। একটু দুঃখ করল, কারণ নঈমের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই, টেলিফোন নম্বরও জানে না। আমি বললাম নঈম নিজেই যোগাযোগ করবে। কিন্তু ৩/৪ তারিখের মধ্যে আমি কোথাও নঈমকে খুঁজে পেলাম না। তার একটা মোবাইল নম্বর আমাকে দিয়েছিল। সে নম্বরে বহুবার ফোন করে কোনো উত্তর পাই নি। আমি চেষ্টা চালাতে থাকব। দেখা যাক ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকায় নঈমের ইচ্ছামতো একটা সমাবেশ হবে কি না বলা কঠিন। তবু চুপ করে বসে থাকা যায় না। ভাবছি '৭১ সালে মুজিববাহিনীকে আমি যেভাবে দেখছিলাম ও চিনেছিলাম, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখা উচিত। প্রবন্ধের বিষয়াদিতে মুজিববাহিনীকে সমালোচনা করার ইচ্ছা নাই। দেশবাসীকে কেবল জানাতে চাই কীভাবে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং '৭১-এ এদের কার্যক্রম কী ছিল। দেখি কাজটি সেরে উঠতে পারি

কি না। তবে মুজিববাহিনী সম্বন্ধে আমি যা দেখেছি, শুনেছি ও মাঠ পর্যায়ে তাদের পরিচয় পেয়েছি সেগুলো এখন লিখে ফেললে ভালো হয়। পরে আবার মন বসবে না।

মুজিববাহিনীর সাথে একাত্তরের সাক্ষাৎ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধে আমাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। খালেদ, শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান এদের নিজ নিজ ব্যাটেলিয়ন ছিল। তারাই যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল দেশের অভ্যন্তর থেকে আগত যুবক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্য। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই তিন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারদের তখনো পর্যন্ত কোনো সাহায্য দেয় নি। সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই দিয়ে যাচ্ছিল।

ওসমানী সাহেব আমাকে আসাম প্রদেশের তুরায় পাঠাবার কথা বলে তার হেডকোয়ার্টারে বসিয়ে রেখেছিলেন। এই মাসেই কোনো একদিন আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। সুসংবাদ দিলেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কিছুসংখ্যক বাছাই করা যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে। বাছাই পর্বের জন্য আমি সেইদিন থেকে কাজ শুরু করি। কারণ আগরতলা তো বটেই শফি, খালেদ ও জিয়া বাহিনীর মধ্যে অনেক যুবক ট্রেনিং প্রাপ্তির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। এ দায়িত্ব আমার একার উপর ন্যস্ত হয় নি। তখন বোধহয় রব ভাই (মেজর জেনারেল রব) আগরতলার আশপাশে কোনো শিবিরে ছিলেন। এ ছাড়াও শুনলাম যে, শেখ ফজলুল হক মনি এবং কয়েকজন ছাত্রনেতাও আগরতলায় অবস্থান নিয়েছে। আমাদের সকলের উপরেই বাছাই করার দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে। মনে পড়ে সেদিন ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখনও ছিল, ছিল আরো একজন নেতা, সম্ভবত আসম রব।

সামরিক ট্রেনিং-এ যুবকদের আগ্রহের কমতি ছিল না। আমি তাদের শারীরিক গঠন ও আকৃতির উপর জোর না দিয়ে শিক্ষিত, সচেতন, বুদ্ধিমত্তা, স্মার্টনেস ইত্যাদি গুণাবলির উপর জোর দিয়ে আমার মতানুযায়ী সব থেকে ভালো ছেলেগুলোকে ট্রেনিং দেবার জন্য পরামর্শ দিয়ে ওসমানী সাহেবের কাছে একাধিক লিস্ট পেশ করতে থাকি। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের কজনকে ডাকা হয়েছিল, কোথায় সমবেত করা হয়েছিল, কখন কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল ইত্যাদি খবরাদি আমাকে দেওয়া হয় নি।

পরবর্তীতে শুনেছিলাম বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে বাছাই করা বহু ছেলেকে দেরাদুনে পাঠানো হয়। এখন আমি মনে করি এই বাছাই পর্বে চূড়ান্ত লিস্ট নির্ধারণে সম্ভবত ছাত্রনেতাদের হাত ছিল। এটুকুই আমি সত্য বলে জানি যে, বাছাইকৃত সবাই আওয়ামী লীগ কর্মী ছিল না। তারা প্রকৃতই দেশপ্রেমিক, সচেতন, উদ্যোগী এবং সেই সময় যুদ্ধে আগ্রহী সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ছিল। বাছাই পর্বের পর আমার এই শিক্ষার্থীদের সাথে আর সম্পর্ক ছিল না। পরে বুঝেছিলাম এদের দিয়েই মুজিববাহিনী গঠন করা হয়েছিল। মুজিববাহিনীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই নামে কোনো বাহিনী যুদ্ধকালীন সময়ে গঠন করা হয় নি।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই কৃতী সন্তানদের ট্রেনিং দেওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। মেজর জেনারেল ওবান ভারতের দেরাদুন নামক প্রসিদ্ধ এলাকার কোনো এক বনাঞ্চলে এই ছাত্রদের পলিটিক্যাল কমান্ডো হিসেবে ট্রেনিং দেন। সামরিক শিক্ষা ছাড়াও রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নক্সালপন্থী মতবাদ পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ প্রভাব ফেলে। আর এই প্রভাব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী একটি মহল গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই মহলের প্রতি আকর্ষণ ছিল ছাত্র সম্প্রদায়ের। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে পেরেছিল যে, এই মতবাদী অসংখ্য ছাত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করবে এবং সম্ভবত তারা একটি বামপন্থী আদর্শে বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্যই পলিটিক্যাল কমান্ডো গঠন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সরলমনা মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের নিরস্ত্রকরণ করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা।

শিক্ষাপ্রাপ্ত পলিটিক্যাল কমান্ডোরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ক্রীড়নক হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা পেত। সে কারণে তারা নিজেরাই তাদের বাহিনীর নাম BLF অর্থাৎ বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স নামে প্রচার করে। ১৬ ডিসেম্বরের পরে তাদের ব্যবহারে ও সদ্য গঠিত বাংলাদেশের সকল স্থানে লুটপাট করার কারণে এদেশের মানুষ এই বাহিনীর নাম দিয়েছিল মুজিববাহিনী। আমার জানা মতে বহু কমান্ডো তাদের বিবেকের কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওদের পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করত।

জুলাই মাসে আমি ৭ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করি। এপ্রিল মাসে বাছাইকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজনও আমার সেক্টরে ছিল না। বলতে গেলে এদের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

অন্যদিকে নক্সালবাড়ির পানিঘাটায় ভারতীয় সেনাবাহিনী উত্তরবঙ্গে অপেক্ষারত সাধারণ একদল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে পানিঘাটায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমার সেক্টরে যোগদান করতে শুরু করে। ৭ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক চৌদ্দ হাজার। এই যোদ্ধাদের দশটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে সীমান্ত ঘাঁটি থেকে, ওসমানী সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হচ্ছিল।

নভেম্বরের কোনো এক সময় আমি মালদায় বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সেক্টর পরিদর্শনে যাই। পৌঁছানো মাত্রই শুনলাম সাব-সেক্টরে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাব- সেক্টরের আশপাশে ও পিছনে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী সশস্ত্র যুবকেরা অবস্থান নিয়েছে এবং তারা নিজস্ব দায়িত্বে ইচ্ছামতো অপারেশন কাজ শুরু করেছে। এই সাব-সেক্টরের সদস্যরা তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে নেপথ্যে অবস্থানকারী যোদ্ধাদের কোনো সহযোগিতা পায় নি। শুনলাম তাদের আচরণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং এই বাহিনী ভারতীয় এক মেজর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। অবস্থা এসে দাঁড়ায় রেষারেষির

পর্যায়ে। আমি আমাদের ছেলেদের পরামর্শ দিলাম যে, তারা যেন কোনো কারণে, কোনো মতেই সংঘাতের পর্যায়ে না যায়। আমাদের ছেলেদের সমবেত করে বললাম যে, আমরা তো সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করছি। সুতরাং যেমন করেই হোক সংঘাত পরিহার করতেই হবে। আরো বললাম যে, এই অজানা বাহিনী সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিংহের হেডকোয়ার্টার থেকে সংগ্রহ করব এবং চেষ্টা করব দু দলের মধ্যে যেন সৌহার্দপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রেম সিং-এর কাছে ব্যাপারটা উত্থাপন করলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। মনে হল তিনি একটু হাসলেনও। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, এই নতুন বাহিনী সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নাই। ভারতীয় মেজর যে এই গোষ্ঠীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সেকথা জানিয়ে বললাম যে, বিষয়টি তো আপনার অজানা থাকার কথা না। তিনি স্বীকার করলেন যে, ভারতীয় মেজরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রেম সিংকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তার কার্যক্রমে যেন তিনি কোনো বাধা না দেন। বিষয়টি খুবই খটকা লাগল। সন্দেহ জাগল যে আমার এলাকায় এই নতুন বাহিনী সন্দেহমূলকভাবে কেন তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে? কী তাদের উদ্দেশ্য?

সপ্তাহখানেক পরে আবার এই সাব-সেক্টরে যাই। পৌছেই দেখলাম ভীষণ গোলযোগ চলছে। সন্দেহজনক সশস্ত্র এক বাঙালি যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখায় আমার ছেলেরা তাকে পাকড়াও করে ফেলে এবং তাকে পাকিস্তানি রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে গুলি করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। ভীত সশস্ত্র যুবক আমার ছেলেদের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। বেশিরভাগ প্রশ্নেই নীরবতা পালন করেছিল। ঠিক এই সময় আমি ওখানে পৌছাই।

আমি আমাদের ছেলেদের বুঝালাম যে, আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধের আন্তর্জাতিক নিয়মাবলিও আছে। সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার হলে তাকে তাৎক্ষণিক হত্যা না করে গোয়েন্দা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করাই হচ্ছে নিয়ম। ছেলেটিকে আমি হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় দেখি। আমি নির্দেশ দিলাম যে এই ধৃত যুবকটিকে সঙ্গে করে তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাব এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পরে প্রেম সিং-এর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের কাছে সোপর্দ করব। আমার সেক্টরে দ্বিতীয়বার এমন কোনো ঘটনা আর ঘটে নি।

এই দ্বিতীয় পরিদর্শনের সময় আমাদের ছেলেদের থেকে শুনলাম যে, উর্ধ্বতন সামরিক কোনো এক কর্তৃপক্ষের আন্ডারে পলিটিক্যাল কমান্ডোরা কাজ করছে। এই কমান্ডোর ব্যাপারটি প্রেম সিং-এর কাছে পুনরায় উত্থাপন করলে তিনি আবারো আমাকে বললেন যে, এরকম একটি বাহিনী উর্ধ্বতন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ করছে এ কথা তাকে জানানো হয়েছে এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাদের কর্মকাণ্ড ব্যাহত করা না হয়।

গুপ্তচর সন্দেহে যে যুবককে আমি সঙ্গে করে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলাম তার চোখ ও হাতের বাঁধন আমি খুলে দিয়েছিলাম। ছেলেটিকে ধীর ও শান্ত প্রকৃতির মনে হল। চলতি গাড়িতে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদে বুঝলাম যে, সে পাকিস্তানি অনুচর নয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষই তাকে সমর শিক্ষা প্রদান করেছে। সাব-সেক্টরের কার্যক্রম ব্যাহত করা তার দলের লক্ষ্য নয়। সে আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে এবং দুরভিসন্ধি নিয়ে সাব-সেক্টরে আসে নি। একটি কথাই সে বলল যে, বিজয়ের পরে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের দায়িত্ব। মুজিববাহিনী সম্পর্কে এই ছিল আমার প্রথম সম্যক ধারণা লাভ।

নঈমের সাথে আর দেখা হয় নি। চট্টগ্রামের ফারুকী আজমের সাথে টেলিফোনে কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছে। ৯ এপ্রিল সকালে আমার স্ত্রী সুলতানা দৈনিক ডেইলি স্টার থেকে পড়ে শোনালো যে, গতকাল অর্থাৎ ৮ তারিখ পূর্ববর্তী প্রোগ্রাম অনুযায়ী ফারুকী আজমের আহূত মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। আরো শোনালো যে, ফারুকী বর্তমানে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করেছে এবং মাস তিনেকের মধ্যেই একটি রাজনৈতিক পার্টি গঠনের ঘোষণা দিবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফারুকী জানিয়েছে যে পার্টির আদর্শ ও লক্ষ্য পরে প্রকাশ করা হবে।

সকাল ৯টার সময় ফারুকীর সাথে কথা হল। ফোন করেছিলাম অভিনন্দন জানাবার জন্য। ফারুকী আজম জানালো যে মিটিং বলতে গেলে আশাতীতই ছিল। আড়াই ঘণ্টা মিটিং চলে। চট্টগ্রামে অবস্থানকারী প্রায় আড়াই শত মুক্তিযোদ্ধা রেজিস্টারিতে স্বাক্ষর দিয়ে গেছে। এই দিন অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যায় এশিয়া একাদশের সঙ্গে বিশ্ব একাদশের একদিনের প্রদর্শনী খেলা ছিল। দেশের সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষই টিভির পর্দায় আবদ্ধ ছিল। তবু ফারুকীর মিটিং-এ যে ভালো সমাগম হয়েছিল এটা বেশ কৃতিত্বের কথা।

মুজিববাহিনী সম্বন্ধে লেখাটি শেষ করে দিলেই ভালো হয়। আসলে মুজিববাহিনী বলে কোনো সংগঠন একাত্তরের যুদ্ধকালীন অবস্থায় গঠন করা হয় নি। এই নামকরণ দেশের মানুষ দিয়েছে এবং দেশের রাজনৈতিক ভিত্তিতেই এর নামকরণ হয়েছে। এদের আসল নাম ছিল পলিটিক্যাল কমান্ডো।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার সাক্ষাৎ

সাব-সেক্টর মেহেদীপুর ও তরঙ্গপুরের ঘটনার পর মুজিববাহিনী নিয়ে আমাদের সেক্টরে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। তবে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কথাবার্তা হত। তাদের কাছে জানতে পারি যে এরা সকলেই ভালো খাওয়াদাওয়া পায়, এরা সবাই হৃষ্টপুষ্ট এবং সকলেই প্যান্ট-শার্ট পরিহিত। অন্যদিকে তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা লুঙ্গি গেঞ্জি গামছা পেয়েই খুশি থাকত। আমাদের ছেলেরা সব সময়ই বলত যে, তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও মেশিনগানের সংখ্যা নেহায়েত কম, সে তুলনায় মুজিববাহিনী নাকি ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ঈর্ষার সাথে আরেকটি কথা বলত

যে মুজিববাহিনীর সদস্যের অনেকেরই কোমরে পিস্তল ঝুলানো দেখা যেত, যা আমার নিজেরও ছিল না।

১৬ ডিসেম্বরের পরে হামজাপুর সাব-সেক্টরের ক্যাপ্টেন ইদ্রিস পরিচালিত সদস্যদের আমি বগুড়ায় স্থানান্তরিত করি। এদের হাতে কোনো কাজ না থাকায় ইদ্রিসের ছেলেরা আশপাশের রাস্তা ও কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত করতে ব্যস্ত ছিল। মনে হয় ডিসেম্বরের প্রায় শেষ দিকে আমি রাত ১০/১১টা নাগাদ ইদ্রিসের টেলিফোন কল পাই। বেশ উত্তেজিত হয়ে সে কথা বলছিল। তাকে একটু নিরস্ত করে তার বক্তব্যটা গুছিয়ে বলতে বললাম।

সেদিন সূর্যাস্তের পরই অন্ধকার নেমে আসলে বগুড়ার সদর বাজার ঘেরাও করে এক অস্ত্রবাহী দল লুটপাট শুরু করে। আর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা এতে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এ ধরনের কাজ করতে পারে না, এই বিশ্বাসে তারা দৌড়ে ইদ্রিসের ক্যাম্পে এসে অভিযোগ তোলে। ইদ্রিসের মতে সন্ধ্যার পর তার একটি সদস্যও ক্যাম্পের বাইরে ছিল না। সুতরাং সে বুঝতে পারে যে, বাজার লুটপাটের কাজে সম্ভবত অন্য কোনো বাহিনীর সদস্যরা জড়িত।

এই খবর পাওয়া মাত্রই ইদ্রিস তার ক্যাম্পের ছেলেদের নিয়ে দ্রুত বাজারস্থলে উপস্থিত হয় এবং বাজারটিকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। ইদ্রিসের ছেলেদের উপস্থিতির সাথে সাথে অস্ত্রধারী লুটপাটকারীরা পালিয়ে যেতে শুরু করে। তবে এদের প্রায় ১০ জন ইদ্রিসের ছেলেদের হাতে ধরা পড়ে। এদের মধ্যে কোনো গোলাগুলি হয় নি। ইদ্রিস এই ছেলেদের ধরে নিয়ে ক্যাম্পে বন্দি করে। ইদ্রিসের টেলিফোন করার কারণ হচ্ছে যে, সে আমার কাছে অনুমতি চাইছিল এই গোটা দশেক ছেলেকে পুঁতে দেওয়ার জন্য। পুতে দেওয়া শব্দটি সে নিজেই ব্যবহার করে। খবরটা শুনে এবং ইদ্রিসের অনুমতি চাওয়ায় আমি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ইদ্রিস ছিল এক অসম্ভব সাহসী যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে মিথ্যা রটনা ও অপবাদ সহ্য করতে পারে নি। এ ছাড়া জনগণের আস্থা লাভের জন্যই, 'মুক্তিযোদ্ধা' নামধারী এই ডাকাতদের তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল।

আমি তাকে বললাম যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের আইনকানুন প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই অবস্থায় তার বাহিনী কর্তৃক ধৃত ডাকাতদের ক্যাম্পে তাৎক্ষণিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, পরের দিন প্রত্যুষে তার ক্যাম্পে উপস্থিত হব এবং ঘটনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেব। আমি আসার আগ পর্যন্ত সে যেন কোনো প্রকার নিজ সিদ্ধান্তে কাজ না করে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অর্থাৎ মধ্যরাতের পরেই আবারো ইদ্রিসের টেলিফোন আসে। তার ভাষা ছিল হতাশাজনক ও উত্তেজনাপূর্ণ। বলতে গেলে সে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তার কথায় জানতে পারলাম যে, ধৃত লুটপাটকারীদের সে ছেড়ে দিয়েছে। এতে ক্যাম্পের ছেলেদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সে জানতে চাইল, আমি কেন এই

ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এরকম কোনো নির্দেশ আমি দেই নি।

ব্যাপারটি সে আবার খুলে বলল। সে রাতে আমাকে টেলিফোন করার কিছুক্ষণ পরই জেনারেল ওসমানী নাকি তাকে সরাসরি টেলিফোন করেন এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবে ইদ্রিসকে হুকুম দেন যে, লুটপাটকারী ১০ জনকে যেন তাৎক্ষণিক মুক্তি দিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে সমর্পণ করা হয়। ইদ্রিস নাকি প্রতিবাদ করেছিল এবং ওসমানী সাহেবকে বলেছিল যে, এরকম লুটপাটকারীদের তাৎক্ষণিক সাজা না দিলে দেশের অন্যত্র এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। প্রত্যুষে আমার বিচার ব্যবস্থার কথাও ওসমানী সাহেবকে জানায়। এ কথা বলায় ওসমানী সাহেব তাকে বেশ ধমকায়। ইদ্রিসকে তিনি আরো জানান যে তিনি (ওসমানী সাহেব) আমার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তার সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। টেলিফোনে ইদ্রিসের অভিযোগ হল আমি কেন তার সব কথা না শুনে ওসমানী সাহেবের সিদ্ধান্তে রাজি হলাম। বলতে গেলে সে আমার কাছে জবাবদিহিতা চাইছে। সে আশা করে নি আমি তার কথা না শুনে ওসমানী সাহেবের নির্দেশ মেনে নেব।

আসলে ওসমানী সাহেবের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হয় নি। তিনি আমাকে টেলিফোন করেন নি বা কারো দ্বারা তার নির্দেশ আমার কাছে প্রেরণ করেন নি। ইদ্রিসের কথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। আর্মির নিয়মকানুন অনুযায়ী কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এক বাহিনীর কমান্ডারকে না জানিয়ে কিংবা তার অজান্তে সেই কমান্ডারের অধীনস্থ অফিসারদের সরাসরি কোনো নির্দেশ দেয়া যায় না। ভদ্র সমাজেও এই নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে। মানসিকভাবে আমিও খুব বিচলিত হয়ে গিয়েছিলাম ওসমানী সাহেবের এই আচরণের জন্য। তখনই আমার মনে তোলপাড় উঠেছিল মুক্তিবাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে।

কিছু প্রশ্ন

মুজিববাহিনীর কথা বলতে গিয়ে এই ঘটনা কেন উল্লেখ করলাম। ধৃত অস্ত্রধারী লুটপাটকারীরা কি আসলেই মুজিববাহিনীর সদস্য কি না সে ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয় নি। তদন্ত প্রয়োজন ছিল। তদন্ত ব্যতীত তাদের ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী হতে পারে। তা ছাড়া এই লুটপাটকারীদের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের হাতে সঁপে দিতেই বা বলা হল কেন? তা হলে কি তারা আওয়ামী লীগেরই কর্মী ছিল? রাজনৈতিক কারণেই যদি তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে এই লুটেরারা নিশ্চয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

'৭১-এ আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনেক লেখালেখি হয়েছে। দেশীয় এবং বিদেশী বিশেষ করে ভারতীয় লেখকেরা এদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এদের সম্পর্কে আমি এটুকুই বলব যে, '৭১-এ তাদের সাথে আমার রণাঙ্গনে দেখা হয় নি। আজ প্রায় ২৯ বছর পরে আমি এটুকু

বলতে পারি যে আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতাদের যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিল তা মার্জনা করা যায় না। এই রাজনৈতিক পার্টি জনসংগঠন গড়ে না তুলে কেবল ছাত্র সংগঠনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ কথা বলার দাবি এ কারণে করছি যে, আমার সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আওয়ামী লীগের কর্মী বা সদস্য ছিল না। তবে এটাও বলা আবশ্যক যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এসব ছেলেরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সমর্থন করত। আমি যতদূর এ ছেলেদের দেখেছি ও বুঝেছি এরা আওয়ামী লীগের রাজনীতি মেনে নিলেও মন মানসিকতায় মওলানা ভাসানীর সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ছিল। তারা আশা করত যে, স্বাধীনতা অর্জনের পরে আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। তবে এ ধারণা যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই পরিবর্তন হতে থাকে। আওয়ামী লীগের দলীয়করণ নীতির ক্রমবর্ধমান আভাস পাওয়া যায়। পলিটিক্যাল কমান্ডো সৃষ্টি হওয়াতে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের মনে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য তাজউদ্দিন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। মন্ত্রিসভার সবাই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত সব সেক্টর কমান্ডারদের এক সারিতে প্লেন অবতরণের জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল। সে অভ্যর্থনার মুহূর্তটি ছিল খুব ভাবাবেগপূর্ণ। আমরা সবাই উদগ্রীব হয়েছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখবার জন্য, তাঁর সাথে করমর্দনের জন্য। ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলই ছিল। প্লেনটি থামা মাত্রই দরজা খুলে শেখ মুজিবকে সরাসরি দেখামাত্রই লক্ষাধিক লোক জয়বাংলা ধ্বনি দেয়। ঠিক এই মুহূর্তেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দুই ছাত্রনেতা সম্ভবত খসরু ও মন্টু এবং শেখ মুজিবের দেহরক্ষী সামরিক বেশে এবং কোমরে পিস্তল বহন করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শেখ মুজিবকে আলিঙ্গন করে। সেদিন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল রক্ষা করা হয় নি। দাপট ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দেরই। এ ঘটনা অশোভনীয়, অমর্যাদাকর ছিল। নজরুল ইসলাম সাহেবের মর্যাদাও রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল।

যাহোক শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঘটনাটি বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, প্রবাদে বলে, Morning shows the day। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ও স্বল্পশিক্ষিত ছাত্রদের প্রভাব যে অটুট থাকবে তার আভাস পাওয়া গেল। শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের দিনের ঘটনার জের আজো বর্তমান।

মুজিববাহিনী সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। এ বাহিনী রণাঙ্গনে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণেই এই বাহিনী গঠন করেছিল। সম্ভবত তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে বিজয়ের পরে মুক্তিবাহিনী যেন কোনো প্রক্রিয়াতে ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবে অবস্থান বজায় রাখতে না পারে।

জেনারেল অরোরার ভিডিও বক্তব্যে এবং জেনারেল জেকোবের প্রকাশিত বই থেকে জানা যায় যে তৎকালীন ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার এই বাহিনী গঠনের পক্ষে ছিল না।

ইস্টার্ন কমান্ডবহির্ভূত কোনো সশস্ত্রবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিক এটা কোনো দিন কোনো কমান্ডের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে দিল্লি কর্তৃক রাজনৈতিক নির্দেশ ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারকে মেনে নিতে হয়েছিল।

মঈদুল হাসানের মূলধারা '৭১ নামক বই থেকে জানা যায় যে, '৭১-এ আওয়ামী লীগের ছাত্র নেতৃবৃন্দ দিল্লি উপস্থিত হয়ে দাবি করেছিল যে তারাই নাকি শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকারী। এখন মনে প্রশ্ন জাগে এ দাবির পিছনে তাদের ভিত্তি কী ছিল? এই নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকেও স্বীকারোক্তি দিতে চায় নি এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক-অবস্থা তৈরিতে তাজউদ্দিনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অবদানের কথা সবাই জানে। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও আস্থা নিবিড়ই ছিল এবং সম্পর্কের ফাটল সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে কোনো দিন কোনো সন্দেহ জাগে নি। তা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কী করে তাজউদ্দিনকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় ছাত্র নেতৃবৃন্দদের উপর স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়িত্ব দেবার কথা ভাবতে পারেন সেটিও বোঝা যায় না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাজউদ্দিনের অপসারণ ও ছাত্রনেতাদের দাপট প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব তাজউদ্দিনের উপর আস্থাশীল ছিলেন না সম্পূর্ণভাবে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রভাবিত মুজিববাহিনী ও বাংলাদেশে গঠিত রক্ষীবাহিনীর প্রভাব ও দাপট সম্বন্ধে আহমেদ মুসা লিখিত 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' বইটিতে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এরপর আমার আর কিছু বলার নেই।

বহুদিন ধরে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছে একাত্তরে আমার রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা লেখার জন্য। এই অনুরোধ করেছেন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সচেতন মুক্তিযোদ্ধারা এবং আমার নিকটাত্মীয়রাও। কিন্তু এই ইতিহাস লিখতে মন চায় না। এই অপরাধবোধটা আমার স্ত্রী বোঝে। সেজন্য এতদিন আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করে নি। এখন সেও আমাকে লেখাটা শুরু করে দিতে বলছে।

১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধে আমি, আমার স্ত্রী সুলতানা, দুই কন্যা নায়লা ও লুবনা এবং একমাত্র পুত্র নদিমসহ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলাম। পারিবারিকভাবে এই সিদ্ধান্ত আমরা ২৬ মার্চ '৭১-এ নিয়েছিলাম। ২৫ মার্চ রাত্রে ধানমণ্ডির ১৩/এ রোডের বাসা থেকে পিলখানার তৎকালীন ইপিআর-এর হেডকোয়ার্টারের ফ্যামিলি কোয়ার্টার থেকে নারী ও শিশুদের যে আর্তনাদ ও ক্রন্দন শুনেছিলাম তা গোটা পরিবারকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তোলে। বলতে গেলে পরিবারের সকলেরই মুখে একই প্রশ্ন ছিল যে, আমি এক পেশাজীবী সৈনিক হয়ে নিরীহ বাঙালি পরিবারের গণহত্যার প্রতিশোধ কি নেব না?

২৫ মার্চ

২৫ মার্চ '৭১-এর প্রথম প্রহরে পাক হানাদার বাহিনী যখন সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে নিরীহ পথচারী, বস্তিবাসী ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে গোলা ছোড়াছুড়ি শুরু করে, শব্দ শুনে আমরা সবাই ছাদে উঠে অবাক, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে ব্যাপারটা কী ঘটছে অনুমান করার চেষ্টা করতে থাকি। ছাদে ওঠার পরপরই আমার ছেলে নদিম তার বন্ধুবান্ধবদের ডাকে নিচে চলে গেল। রাত তিনটা নাগাদ তার কোনো সন্ধান না পাওয়াতে আমরা খুবই ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না। হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ট্রাকে করে রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। তিনটার পরে নদিম ফিরে আসে। তার চেহারা দেখে মনে হল তার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। সে আর ১৫ বছরের বালক নয়। মলিন ও ছিন্ন কাপড়ে সে বাড়ি ফিরে আসে তার মায়ের .২২ রাইফেল হাতে নিয়ে। সে জানালো যে, আরো ৪ জন বন্ধু তাদের বাবার বন্দুক বের করে নিয়ে আসে, ৩২নং ধানমণ্ডি রোডে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল শেখ সাহেবকে রক্ষা করার জন্য। কারণ তার বন্ধু-বান্ধবেরা বুঝতে পেরেছিল যে, শেখ সাহেবের বাড়ি রাত ১১টার দিকে আক্রান্ত হয় এবং তারা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পায়। মুক্তিযুদ্ধের কোনো ঘোষণা না দেওয়া সত্ত্বেও স্কুলে অধ্যয়নরত বালকেরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং আমার মুক্তিযুদ্ধে না যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আমি সমর শিক্ষাপ্রাপ্ত এক সৈনিক, আমার পক্ষে এক .২২ রাইফেল নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হত না। ২৬ তারিখ মধ্যাহ্নে আহারাদি সম্পন্নের পরে আমার কন্যাদ্বয় একটি ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে ছুটে এসে বলল কে যেন কোথা থেকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত কিছু ঘোষণা দিচ্ছে। রেডিওর আওয়াজ ছিল খুবই ক্ষীণ। তবুও বুঝতে পারলাম যে জিয়া নামক এক মেজর নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছেন। এই প্রচার যে কত বড় সুখবর ছিল তা বলা যায় না। বুঝলাম মুক্তিযুদ্ধ দানা বেঁধেছে। যেহেতু এই ঘোষণা একজন মেজর কর্তৃক দেওয়া হয়, অতি সহজে বুঝতে পারলাম বাঙালি সৈনিকেরা ইতোমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। প্রশ্ন জাগল এরা কারা এবং কোথায়? তাদের খোঁজ নেওয়াটা এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াটাই আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

তবে এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে অপরাধবোধ কেন? এই যুদ্ধ ছিল সমস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে একটি মহান ঘটনা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের জন্য কোনো প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও ২৫ মার্চের রাতের ভয়াবহ গণহত্যার পর দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় যুদ্ধে নেমে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ ও আচরণ এতই জনবিমুখী ছিল এবং এসব ঘটনার আমি যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম এগুলো না লিখলে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এসব ঘটনা কি প্রকাশ করা উচিত? এসব ঘটনাবলি কি মুক্তিযুদ্ধকে

মলিন করে দেবে না? আমি কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লিখব? আমি কি সত্য গোপন করব? আর এই সত্য প্রকাশ করাটা কি জাতি ও নতুন প্রজন্মের জন্য শুভ হবে? এই দ্বন্দ্ব নিয়েই এতদিন ভুগে আসছি। আজ আর সেই দ্বিধায় ভুগছি না। ঠিক করেছি যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের আমি সেই ইতিহাসটুকুই লিখব যা আমি দেখেছি ও শুনেছি। এই লেখা যদি শেষ করতে পারি তা হলে যারা এই বইটি পড়ার সুযোগ পাবে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে আমার বিষয়াদি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে অনেক মনগড়া কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির কোনো বাস্তব ভিত্তি বা প্রমাণাদি নাই। বুঝতে পারি না ইতিহাস বিকৃত করে ভবিষ্যতে কোনো সুফল পাওয়া যাবে কি না? যারা এ প্রয়াসে ইতিহাস বিকৃত করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কারণ ইতিহাস নিজেই অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বিজয়ী হয়ে এসেছে সময়ের যাঁতাকলে অসত্যকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিয়ে। ইতিহাস এক বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। সমষ্টিগত মত ও বাস্তবের প্রেক্ষিতে মেজে-ঘষে সারাংশটুকুই ইতিহাস গ্রহণ করে। আমি যে আজ লিখছি এটিও আমার নিজস্ব মত ও দৃষ্টিকোণ থেকে। এগুলিও ইতিহাস অবশ্যই তার নিজস্ব গতিতে যাচাই করে দেখবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা কার দ্বারা সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল এবং তার ভাষা কী ছিল এ নিয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা আজো চলছে এবং সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমার মতামতও এই বিতর্কে মিলিয়ে যাবে। তবু আমি মনে করি এই সংক্রান্তে যা দেখেছি ও শুনেছি তা লিখে ফেলাই ভালো।

মার্চ ১৯৭১ সালে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছিলাম এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলাম না। তবে প্রবাদে আছে যে সচেতন ব্যক্তি মাত্র a political being। সে সময় মওলানা ভাসানীর আন্দোলনে সাম্যবাদের বার্তা আমাকে প্রভাবিত করলেও, স্বাধিকার আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়েছিল, তা আমি সমর্থন করতাম।

৭ মার্চের মিটিং-এর বিশেষ বর্ণনা দেব না। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল, মাথায় লাল ফিতা বাঁধা ও হাতে লাঙল নিয়ে কৃষকেরাও সমবেত হয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবের সাথেই উপস্থিত ছিলাম। সকলেই আশা করছিলাম যে সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হবে। আসলে আমাদের এ ধারণা ছিল আবেগপূর্ণ এবং বিতর্কিত।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সংসদের অধিবেশন এবং মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছিল। এটিই সঠিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলেছিলেন যে, 'যদি আমার আর একটি লোকের উপরে গুলি চলে, তা হলে...।'

তিনি 'আমার' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন কেন? 'আমার' বলতে তো পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী সকল লোককে বুঝায়। বুঝায় ভাসানী সমর্থকদের,

বামপন্থীদের, আমলা, ব্যবসায়ীদের এবং সকলকে। তাঁর 'আমার' শব্দের ব্যবহারে কেউ প্রতিবাদ করে নি। এই শব্দ ব্যবহারের অধিকার তাঁর উপরে কেউ ন্যস্ত করে নি। স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি সকলের অজ্ঞাতে এই অধিকার অর্জন করেছিলেন এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

৭ মার্চের সভায় তাঁর বক্তব্য পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে শেষ করেছিলেন। তাতে তিনি তো কোনো অন্যায় করেন নি। পাকিস্তান অবিভক্ত ছিল রাজনৈতিকভাবে। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চলছিল জনমতের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। সুতরাং রাজনীতিক হিসেবে তিনি তাঁর ভাষণ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষাধিক লোক থেকে সেদিন কোনো প্রতিবাদ আসে নি। অবশ্য তাঁর বক্তব্য শেষ করার পরমুহূর্তে ছাত্রনেতৃবৃন্দের পরামর্শে তিনি মাইকে ফিরে এসে জয় বাংলা ধ্বনিও উচ্চারণ করেছিলেন, যা সেদিন সমবেত জনগণকে উল্লসিত করেছিল। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলাতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নি এবং তাঁর ভাষণ রাজনৈতিকভাবে সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণই ছিল।

অথচ আজকাল ৭ মার্চের এই ভাষণ থেকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কথাটি মুছে ফেলা হয়েছে। কেন? কী কারণে? এতে আমি মনে করি মুজিবুর সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে খাটো করা হয়েছে। আরো বড় ক্ষতি হয়েছে, যে সম্প্রদায় এই কাজটি করেছেন তার প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে।

এবারে স্বাধীনতা ঘোষণার কথায় আসি। আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, ২৬ মার্চ দুপুরের দিকে ট্রানজিস্টারে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বক্তব্য শুনেছিলাম। জনাব মঈদুল ইসলাম, জেনারেল শফিউল্লাহ এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বেলাল মোহাম্মদের লেখা থেকে জানতে পারা যায় যে, ২৬ মার্চ দুপুরে বেতারের পাঁচ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ঘোষণাটি নিয়ে মতবিরোধ চলছে।

বেলাল মোহাম্মদ সাহেবের মত অনুযায়ী, শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত বক্তব্যটি শুরু হয় 'অদ্য রাত বারোটায় বর্বর পাকবাহিনী ঢাকার পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়েছে। যুদ্ধ চলছে। আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি—জয়বাংলা।' উপরোক্ত ঘোষণায় 'অদ্য বারোটা' ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ঘোষণাটি রাত বারোটার পরেই লেখা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহিদের কথা বলা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শহিদের কথা তিনি পেলেন কোথায়? তাঁর টেলিফোন তো বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। '৭১-এ ২৫-এর রাত নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব নিজেই সকলকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁর বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বলেন। মঈদুল ইসলাম সাহেবের ভাষায় 'চট্টগ্রাম বেতারে এসব ঘোষণার পেছনে না ছিল এ ধরনের রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি।'

'৭১–এ এপ্রিলের শেষ দিকে তাজউদ্দিনের সঙ্গে আমি মেজর জলিলের নয় নম্বর সেক্টর পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। যাত্রী আমরা দুজনই ছিলাম। এই বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৫ খণ্ডের কোনো এক খণ্ডে লেখা হয়েছে। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর হয়ে কেমন করে কখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন।' জবাবে আমি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথা বলি। জিয়া কর্তৃক নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে পরিচয় দেওয়ার কথা উল্লেখ করি। আমার জবাবে তিনি নিরুত্তর ছিলেন এবং অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

এপ্রিলের ১০ তারিখে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে মেজর রফিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। ২২/২৩ মার্চ থেকে তিনি যুদ্ধের জন্য যেসব উদ্যোগ ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার বর্ণনা শুনে আমি মুগ্ধ হই। জিয়াউর রহমানকে তিনি কীভাবে তার দলে টেনে আনেন তা বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন। এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জিয়াউর রহমান বিদ্রোহীদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হওয়ার কারণে রফিক জিয়াকে বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা দেবার প্রস্তাব দেন। তবে এই ঘোষণা কবে, কখন এবং কী ভাষায় দেওয়া হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেন নি। এটি আমাদের আলোচনার বিষয়ও ছিল না। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথাই আমরা আলোচনা করছিলাম।

২৭ মার্চ ১৯৭১–এর কালুরঘাটে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচার শুরু হওয়ার প্রারম্ভে বেতারের বেলাল মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেন এবং এটি লিখে ফেলতে বলেন। জিয়া প্রথমে লিখেছিলেন, 'I Major Zia-ur-Rahaman do hereby decelerate Independence of Bangladesh....' এটি পরে পরিশোধন করা হয় এবং অন বিহ্যাফ অব শেখ মুজিব লেখা হয়। আমি মনে করি ২৬ মার্চ দুপুর ১২টায় জিয়া নিজস্ব বক্তব্য রেখেছিলেন। এই ঘোষণা, তবে ভাষা নয়, দেওয়ার বন্দোবস্ত বোধহয় মেজর রফিক করে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান সাহেবের প্রচারিত বক্তব্য অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কোনো ঘোষণা দেওয়া হয় নি বলে আমি মনে করি।

'৭১–এর এপ্রিলের মাঝামাঝি কোনো একসময় আওয়ামী লীগের জনাব জহুর আহমদ ও আমি একই কামরায় কয়েক রাত কাটিয়েছিলাম। স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যা শুনেছেন আমিও তাই শুনেছি।' এ নিয়ে আমরা আর ঘাঁটাঘাঁটি করি নি। কারণ ঘোষণা বিষয়টি তখন ছিল গৌণ এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রামই ছিল মুখ্য। ধরা যাক জিয়াউর রহমানই ছিলেন স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। এতে কী আসে যায়? এই ঘোষণা কি আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানকে খাটো করেছে? আদৌ না।

জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনেই আমি ও আমার মতো হাজার হাজার সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্য প্রেরণা পেয়েছিল। জিয়া ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল

রেজিমেন্টের অফিসার। তার প্রেসিডেন্ট পদের দাবি করা আমাদের মনে প্রভাব ফেলে নি। তবে তাঁর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক আমাদের সকলকে অনুপ্রেরিত করেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক কে ছিলেন—এ নিয়ে জাতির মধ্যে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে এটি শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি। মুজিবুর রহমান কী আদর্শে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন সেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত ছিল।

এই বিষয় নিয়ে আমি গবেষকদের আরো বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করব। সত্য প্রকাশিত হওয়াই ভালো। কিন্তু অসত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য যেন অসত্য তথ্যগুলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো চেষ্টা করা না হয়। কারণ আমি আগেই বলেছি যে, '৭১-এ ২৬ ও ২৭ মার্চে দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘোষণাটি কে দিয়েছিল এবং কী ভাষায় প্রচার করা হয়েছিল, তার আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই। ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল এটাই বড় কথা। কারণ ঘোষণার রাজনৈতিক উৎস দেশবাসী জানত ও বুঝত। জিয়াউর রহমান সাহেব কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। জনগণের কাছে তার কোনো পরিচিতিও তখন ছিল না। তবুও জনগণ তার ঘোষণা গ্রহণ করেছিল, তার ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে আমার জন্ম এমন সময় হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। জীবনে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে। তবে আমি এবং আমার পরিবার ২৫ মার্চ রাতেই যে তাৎক্ষণিক যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম তার পেছনে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। এ কথা বললে ভুল হবে না, সব মুক্তিযোদ্ধাই তাদের দেশাত্মবোধ এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব অনুভব করে যুদ্ধে গিয়েছিল।

আমি যে স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি সেটা কেবল মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেই। কারণ বারবার আমার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এগুলোও লিপিবদ্ধ করা উচিত। আমার স্বজন ও ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমার কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের মূল কারণ সম্বন্ধে অবগত হবে। জীবনের কিছু কিছু ঘটনা আমাকে বারবার স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আমার রাজনৈতিক সচেতনতার ইতিহাস

১৮ বছর ৩ মাস বয়সে আমি ব্রিটিশ ভারতের নৌবাহিনীতে যোগদান করি, ৬ জুন ১৯৪৩ সালে। তখন ভারতে স্বরাজ আন্দোলন চলছে। সচেতন ছাত্র মাত্রই রাজনীতির সাথে পরিচিত ছিল এবং এদের সকলেরই মনোভাব ছিল ব্রিটিশবিরোধী। নৌবাহিনীতে যোগদান করে ব্রিটিশ অফিসারদের প্রাধান্য দেখতে পাই। এই বিদেশী অফিসারদের ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা ছিল। সার্বক্ষণিক তাদের সঙ্গে থাকার জন্য ভারতীয়দের আচরণ নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। নৌবাহিনীতে থাকাকালীন সময় আমার সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারদের দু বার মারপিটও হয়েছিল। ভারতীয়

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরূপ সমালোচনা করা থেকে তাদের বিরত থাকার কথা বলতাম। তখন-হিন্দু মুসলমানের প্রশ্নটা বড় ছিল না। ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা দেশী অফিসারদের মনে জাগ্রত থাকারই কথা। তর্কের কারণে এবং ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্বকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য আমরা নীরব থাকতে পারতাম না। দু বার কোর্ট মার্শাল হওয়ার পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও আইয়ুব খানের সাথে মুখোমুখি কয়েকটি ঘটনা আমার সেনা জীবনে প্রভাব ফেলেছে। ১৯৪৯ সালে আমি JSPCTS কোয়েটায় প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে তৎকালীন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল আইয়ুবসহ ইরানের অ্যাম্বাসেডর ও উচ্চপদস্থ দুএকজন দেশী-বিদেশী কর্মচারী এই ভোজে ছিলেন। স্কুলের কমান্ড্যান্ট আমাকে আইয়ুবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল আমার দেশ কোথায়? পূর্ব পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা মাত্র তিনি বিদেশীদের লক্ষ্য করে মন্তব্য করলেন যে, ভারত বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সেনাপ্রধান ছিলেন। এরই সাথে তিনি অকারণে একটি মন্তব্য করলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি ঢাকার নবাব বাহাদুরের পরিবার ছাড়া আর কোনো ভদ্র পরিবারের সন্ধান পান নি। এ মন্তব্যে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে বলি যে, ভদ্রলোকেরাই তো ভদ্রলোকের সন্ধান পায়। আমার কথা শুনে বিদেশীরা সবাই মুচকে হেসে ওঠে এবং আইয়ুব খানের মুখমণ্ডল রক্তিম আকার ধারণ করে। আমি দ্রুত এই অবস্থান থেকে প্রস্থান করি।

ঢাকা চৌদ্দ ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল ওমরাও খান দ্বারা আয়োজিত আইয়ুব খানের উদ্দেশ্যে মধ্যাহ্নভোজে ইউনিট কমান্ডার হিসেবে আমাকেও আমন্ত্রণ, করা হয়েছিল। এই দাওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন আইজি জাকের হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ওমরাও খান ও আইজির সাথে হচ্ছিল। কীভাবে যেন আরেক প্রাক্তন বাঙালি আইজি ইসমাইল সাহেবের কথা ওঠে এবং এর সম্পর্কে আইয়ুব ও জাকের হোসেন সাহেব নানা প্রকার বিরূপ সমালোচনা করতে থাকেন। তাদের ভাষা মার্জিত ছিল না এবং মন্তব্য ছিল অশ্লীল। ইসমাইল সাহেবকে অযোগ্য পুলিশ হিসেবে চিহ্নিত করেন জাকের সাহেব। এটাও বলা হয় যে পুলিশের চাকরি করে তিনি পর্নোগ্রাফি নিয়ে গবেষণায় দিন কাটিয়ে যৌনসংক্রান্ত একটি বইও লিখেন। পরবর্তীকালে জানতে পারি ইসমাইল সাহেব নানাবিধ বিষয়ে গোটা ৪০ বই রচনা করেছেন এবং তাকে সাহিত্য পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। একপর্যায়ে আইয়ুব বলেন যে, 'আবুল হাসনাতকে আমি আমার আর্মিতে লেন্স নায়েকেরও মর্যাদা দিতাম না।' চারদিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। ঘটনাটি লেখার কারণ হচ্ছে এই আলোচনা আমার ওপর বেশ প্রভাব ফেলে। বাঙালি দালালরা যে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে মাথা হেঁট করে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আইয়ুবের কথাবার্তায় বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমি বিব্রতবোধ করতে থাকি কিন্তু জাকের হোসেন সাহেব

আইয়ুবের কথায় সায় দিয়ে হাসি ভরে উপভোগ করছিলেন মনে হল। এ ধরনের বাঙালি চাটুকারদের প্রতি আমার একটা ঘৃণা জন্মাল।

আইয়ুবের সাথে আমার তৃতীয় মুখোমুখি ঘটনাটি ঢাকা সেনানিবাসে আমার তোপখানা ইউনিটে। ইউনিট পরিদর্শনে আইয়ুব খুশি হন। প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সকলের সাথে সহজ, সরল ও সহাস্য কথা বলতে থাকেন। একসময় ইউনিটের বাগানে ছোট কাঁঠাল দেখে ইঁচড় খাওয়ার কথা তুলে তিনি আমাদের রেঁধে খাওয়ার পরামর্শ দেন। তার এই অমায়িক ও স্নেহশীল মনোভাব দেখে আমি জেনারেল আইয়ুবকে আমার অফিসারদের সাথে এক পেয়ালা চা বা কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। বললেন, এটা সম্ভব নয়। কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যেই গভর্নর ভবনে কফির দাওয়াত রয়েছে। একটু পরেই তিনি তার এডিসিকে ডেকে বললেন, গভর্নর দফতরকে জানিয়ে দিতে যে, তিনি কর্মব্যস্ততার জন্য কফির দাওয়াতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এবং আমাকে বললেন যে তোমাদের বেড়ার অফিসে কফি না খেয়ে মাঠে বসে তোমাদের সাথে একটু গল্প করি। চমৎকারভাবে সবকিছু চলছিল। কফিও এসে গেল। হঠাৎ তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার দেশ কোথায়? আমি বললাম, 'Sir, I am a son of this soil'. শোনামাত্রই তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি তার চেয়ার তুলে ১৮০° ঘুরিয়ে অন্যমুখী হয়ে বসলেন। আমি ও আমার অফিসার এবং চৌদ্দ ডিভিশনের জেনারেল ও তার স্টাফসহ সকলেই প্রচণ্ড বিস্মিত হই। একটু পরেই আইয়ুব বলল, 'আমি যাই, আমাকে যেতে হবে।' আমি পূর্ব পাকিস্তানি হওয়াতে আমার ইউনিট ও অফিসাররা কী দোষ করেছিল বুঝতে পারলাম না। আইয়ুব খানের আচরণ ছিল আকস্মিক, অশোভনীয় ও অপমানজনক। এ ঘটনাকালে তৎকালীন লে. সামসুজ্জোহা, যিনি পরবর্তীকালে যুগোশ্লাভিয়াতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন, উপস্থিত ছিলেন।

আইয়ুবকে নিয়ে আমার শেষ অভিজ্ঞতা মুখোমুখি হয় নি। ১৯৫৮ সালে আমি Staff College-এ ছিলাম। নভেম্বরের মাঝামাঝি কলেজের দফতর থেকে নির্দেশ আসে যে, সামরিক বলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী জেনারেল আইয়ুবের থেকে প্রাপ্ত একটি গোপন চিঠি কলেজের ছাত্ররা যেন পড়ে সই দিয়ে আসে। সারি বেঁধে সকলে সই দিয়ে আসছিল। আমি কিন্তু চিঠিটা ভালো করে পড়ে নিলাম। চিঠিতে সকল অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেনারেল আইয়ুবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে। আমি আপত্তি জানিয়ে সই না করে বেরিয়ে আসি। একটু পরে জানতে পারলাম আমার মতো সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর সালাউদ্দিন মোঃ আমিনও সই না করে বেরিয়ে আসেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের জানান এই সামান্য বিষয় নিয়ে আমাদের দু জনের আচরণ খুব একটা শোভনীয় হয় নি। এই ঘটনা নিয়ে আর বাড়াবাড়িও হয় নি। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে দেখা গেল আমরা উভয়ই তিন বছরের মধ্যেই সামরিক বাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলাম।

এই অবসর গ্রহণে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার টিক্কা খান বিশেষ আপত্তি জানান। রাওয়ালপিণ্ডিতে গ্রেটমল হোটেলে অবস্থানরত আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করে পরামর্শ দেন যে আমি যেন অবসর না নিয়ে বছর দুয়েকের জন্য বেসামরিক সংস্থায় বদলি হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করি।

১৯৬১ সালে আমাকে EPIDC-তে বদলি করা হয়। আমি এই সংস্থা থেকে আর সেনাবাহিনীতে ফিরে যাই নি। ১৯৬৮ সালে আমি নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছিলাম। এসময় একদিন রাওয়ালপিণ্ডির GHQ থেকে এক AQ (লে. কর্নেল) আমার সাথে দেখা করতে আসেন জেনারেল টিক্কা খানের প্রদত্ত একটি চিঠি নিয়ে এবং অনুরোধ করেন এই চিঠিতে স্বাক্ষর দিতে। চিঠিটা ছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জমি পাওয়ার জন্য একটি আবেদনপত্র। আমি যখন আবেদনপত্রটা পড়ছিলাম AQ সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আপনার জমি ইতোমধ্যে বরাদ্দ করা হয়ে গিয়েছে এবং গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আপনার কোনো আবেদনপত্র জমা পড়ে নি।

সেনাবাহিনীতে চাকরি করা অবস্থায় পাকিস্তানের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারছিলাম যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব আরো জটিল হয়ে উঠবে। এ ছাড়া আমার মধ্যে একটা উপলব্ধি এসেছিল যে, সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে দেশের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কাজে অবদান রাখার সুযোগ পাব না।

১৯৬৮, ৬৯, ৭০ সালে দেশেই ছিলাম। ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলন আমি দেখি ও বুঝবার চেষ্টা করি। ১৯৭০ সালে EPIDC কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ হয়। আমি ইস্তফা দেই। তখন ছয় দফার আন্দোলন জোরদার চলছিল। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পরে এই আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনে রূপায়িত হয়। এই আন্দোলনে আমার কোনো অংশ গ্রহণ ছিল না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে আন্দোলনের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের প্রতি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশ করার হিড়িক পড়েছিল। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরও একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, যা কিনা এখন RAOWA নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের কোনো একসময় এই প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দ সমবেত হয়ে মিছিল করে শেখ সাহেবের প্রতি তাদের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। জানি না কেমন করে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমার অনুপস্থিতি অনেক বন্ধু-বান্ধবের নজরে আসে। তারা আমাকে সতর্ক করে দেয় যে অনুপস্থিতির ফলাফল আমার জন্য ভালো হবে না। এই কথায় আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু '৭১-এ স্বাধীনতার সংগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সদস্যকেও রণাঙ্গনে দেখতে পাওয়া যায় নি।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের লোকদের কথায় ও কাজের মধ্যে মিল না থাকা উপরোক্ত ঘটনায় পরিচয় দেয়। পরবর্তীকালে এই ধরনের অগণিত দৃশ্য দেখে এসেছি এবং এখনো সমাজে ও রাজনীতিতে দেখতে পাচ্ছি।

১৯৭১

২৫ মার্চ ১৯৭১ রাত ৮/৯টার দিকে আমার 'ফোক্স ওয়াগনে' সস্ত্রীক ইস্কাটনে মেজর আমিনের বাসার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। পিজি হাসপাতাল বিল্ডিং-এর কয়েক গজ পশ্চিমে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলাম। দেখলাম একাধিক যুবক, যাদের ছাত্র বলে মনে হল, রাস্তায় ব্যারিকেড বসানোর চেষ্টা করছে। ব্যারিকেডের নমুনা দেখে মনে মনে হাসলাম। এগুলো এতই তুচ্ছ যে, সেনাবাহিনীর পক্ষে সরিয়ে দেওয়া কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আমার স্ত্রীও নামল। দুজনে কয়েকটি যুবককে ডেকে পরামর্শ দিতে চেয়েছিলাম। ব্যারিকেডের উপর আমার মন্তব্য তাদের ভালো লাগে নি। দেখে মনে হল তারা খুব উদ্ধত। সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের নাকি। ব্যাপারটা বেগতিক হওয়ার আগেই তাদের শান্ত করে বাড়ি ফিরে এলাম। তবে যুবকেরা যে সেনাবাহিনীর সেই রাতে মাঠে নেমে পড়ার আভাস পেয়েছিল বুঝলাম। ফেরার পথেও কেন জানি না একটু খটকা লাগল। মনে হল শহরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক। বিভিন্ন জায়গায় এরকম ব্যারিকেড স্থাপনের কাজ চলছে। ব্যারিকেড দেওয়ার আদেশ কে তাদের দিল জানি না।

এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়ল। ১৯৮০-৮১তে আমি মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলাম। সেসময় সিলেটের জাকির চৌধুরী নামক এক যুবক, যিনি পেশায় ছিলেন 'ব্যাংকার', তিনি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। কোনো একসময় তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ছিলেন। এসময় EPR-এর এক সুবেদার সাহেব এই কর্মস্থলে এসে মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তাকে নাকি কেউ পাত্তাই দিচ্ছিল না। কিন্তু তার অস্বাভাবিক ও উত্তেজিত গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ অন্দরমহলের মিটিং-এ পৌঁছে যাওয়াতে একসময় তৎকালীন কর্নেল ওসমানী বেরিয়ে এসে সুবেদার সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুবেদার সাহেব জানান যে, তিনি জানতে পেরেছেন যে ঐ রাতেই গভীর প্রহরে EPR সদস্যদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ হতে পারে। এই হত্যাযজ্ঞ এড়াতে তিনি আওয়ামী লীগের নির্দেশ চান। ওসমানী সাহেব রাগান্বিতভাবে বলেছিলেন যে, EPR বাহিনী প্রাদেশিক সরকারের আদেশে চলে। তিনি ও তার আওয়ামী লীগের সহকর্মীরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ওসমানী সাহেব নাকি ইংরেজি ভাষায় আরো বলেছিলেন যে, Violence আওয়ামী লীগের নীতি নয় এবং সুবেদার সাহেবকে প্রস্থান করতে বললেন। তা হলে ২৫ মার্চ রাত্রে আমি যে যুবকদের যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি দেখেছিলাম সে আদেশ কোন মহল থেকে এসেছিল বা কারা দিয়েছিল?

২৫ মার্চ রাত ১২টার আগেই টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই যোগাযোগ সহজে হচ্ছিল না। এমনকি বেশি কিছু খবরও কোনো মহল থেকে সংগ্রহ করতে পারি নি। এ ছাড়া এর আগেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম ও কিছু সামরিক যানবাহন নজরে পড়েছিল।

পরিবারসহ আমি ছাদেই ছিলাম। আমার বাসা থেকে ৩২নং এলাকার Sky-line দেখা যায়। এই এলাকা থেকেও গোলাগুলির শব্দ পাই এবং একসময় তিনটি 'ভিয়ারি লাইট' দেখতে পাই। এই লাইটগুলো হচ্ছে সামরিক বাহিনীর নানা রঙের আতশবাজি, যেমন– লাল, সবুজ, সাদা। এর মাধ্যমে সংকেত দেওয়া হয় কোনো 'প্ল্যান' কার্যকর করার প্রারম্ভে বা শেষার্ধে। বুঝলাম যে ৩২নং রোড এলাকায় কিছু ঘটনা ঘটছে বা ঘটে গিয়েছে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাত্রে গোটা পরিবারই ছিল উদ্বিগ্ন। সকলের মুখে ছিল উদ্বেগের ছাপ। ১৩/এ ধানমণ্ডি রোডে আমার বাসা পিলখানার উত্তর গেট থেকে ২/৩ শত গজ উত্তরে ছিল। মধ্যরাত থেকে কয়েক ঘণ্টা আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে থাকি। তারই মধ্য থেকে ভেসে আসছিল নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তনাদ। পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। স্ত্রী ও সন্তানরা কান্নাকাটি ও আহাজারির ব্যাখ্যা চাইছিল। অনুমান করতে ভুল করি নাই যে, ইপিআর জোয়ানদের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে হত্যাযজ্ঞ চলছিল। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পরিবারকে দিতে ভরসা পাই নি।

আমার বাড়ির দক্ষিণে ছিল ধানমণ্ডির লেকের একটি অংশ এবং উত্তরের রাস্তার দু-চারটি বাড়ির পরেই ছিল পথে হাঁটা রাস্তা যা নদী পর্যন্ত গেছে। এই দু দিকে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ইপিআর–এর জোয়ানরা একা বা দুএকজন সঙ্গীসহ ঊর্ধ্বশ্বাসে নদী মুখে যেতে থাকে। এদের পরনে ছিল লুঙ্গি, হাফ প্যান্ট এবং প্রায় সকলেই ছিল খালি পায়ে। বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে দুএকজনকে থামিয়ে কিছু খবর জানতে চাই। তারা কেউই আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। উল্টো দুএকজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন রাতে বৃথাই বহু সময় নষ্ট করেছিলাম টেলিফোনের পাশে। বাইরের সাথে যোগাযোগ না থাকায় মন আরো অস্থির হয়ে ওঠে। উঁকি মেরে আশপাশের প্রতিবেশীদের খোঁজ নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু সব বাড়ি ছিল আলোবিহীন, নীরব স্তব্ধ। মনে নেই সেই রাতে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। তবে প্রত্যুষেই ঘুম ভেঙেছিল বাড়ির গেটের সামনে গুলির আওয়াজ শুনে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একজন 'করপোরাল' স্টেগান থেকে ফাঁকা গুলির আওয়াজ করতে করতে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম এ কাজটি করা হচ্ছে জনগণের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

আমার পাশের পূর্ব দিকের দোতলা বাড়ি ছিল সাত মসজিদ রোডের ওপর। ভাড়াটিয়া ছিল এক বিদেশী। সকালবেলায় কোনো রকমে ওর সাথে যোগাযোগ করি।

পরিচয়ে জানতে পারলাম তার দেশ যুগোশ্লাভিয়াতে। বড় রাস্তায় কী ঘটছে দেখার জন্য তাকে অনুরোধ করাতে সে আমাকে আগ্রহের সাথে তার বাড়ির চিলেকোঠায় নিয়ে যায়। রাস্তায় দুএকটা APC (Armed Personal Carrier) দেখলাম। অবাক হলাম এসব গাড়ির ব্যবহার দেখে। প্রতিপক্ষের গোলাগুলি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। মনে প্রশ্ন জাগল তা হলে কি সশস্ত্র সংগ্রামের ভয়ে তারা ভীত? মনে আশার সঞ্চারও হল।

বিদেশী ভদ্রলোকটি ছিলেন অমায়িক। কফি খেতে বললেন। টেবিলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। জানালেন যে তিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল টিটোর গেরিলা বাহিনীতে ছিলেন। তার অনুমানে বিগত রাতের কর্মকাণ্ড এক গণজাগরণের আভাস দেয়। জানি না তিনি পলিটিক্যাল পারসন ছিলেন কি না। আমাকে সাহস দিলেন। বললেন যে, গেরিলা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জনগণ সমূহ ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়েন। কিন্তু শেষ অবধি জয় জনগণেরই হয়। অস্ত্রের কথা আসায় জানালেন যে, গেরিলা যুদ্ধে অস্ত্রের অভাব হয় না। আমাদের হাতে যে অস্ত্র আসবে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। দেওয়াল টপকে বাড়ি ফিরে এসে এই সাক্ষাৎটা স্ত্রী ও সন্তানদের বললাম।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সেদিন যা কথাবার্তা হয়েছিল মনে নাই। তবে একটি কথা মনে গেঁথে রয়েছে। তারা অনেকবারই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আব্বু তুমি তো পেশাদার সৈনিক, এই গণহত্যার প্রতিশোধ নেবে না?'

২৬ মার্চ দুপুরে আমি মেজর জিয়া কর্তৃক ঘোষণার কথা আগে উল্লেখ করেছি। বিদেশীর দেয়া অনুপ্রেরণা, পরিবার কর্তৃক প্রতিশোধের তাগিদ এবং জিয়ার ঘোষণা আমাকে বারবার মুক্তিযুদ্ধে যাবার অনুপ্রেরণা দিচ্ছিল। ২৭ মার্চ সকাল থেকে বোধহয় দুপুর ২টা পর্যন্ত কারফিউ রহিত করা হল। আমার 'ফক্স ওয়াগন' নিয়ে নিউমার্কেট হয়ে দুএকজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গিয়েছিলাম। পথের মধ্যে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলাম এবং আতঙ্কিত লোকজনের চেহারা দেখেছি তা বেশ মনে পড়ে। বিগত রাত্রের ঘটনাবলি নিয়েই তারা উত্তেজিত ছিল। কেনাকাটাও করছিল খুব। বড় প্রশ্ন ছিল যে, মেজর জিয়া কে? সে কোথায়? এবং অন্যান্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কী পদক্ষেপ নিয়েছে। মনে নেই কে একজন খবর দিল যে, জয়দেবপুরে অবস্থানরত একটি ব্যাটেলিয়ান উত্তর মুখে রওনা হয়েছে সম্ভবত টাঙ্গাইলের দিকে। মনের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল পরিবারকে কোথায় নিরাপদে রাখতে পারব। দুএকজন আত্মীয়স্বজনের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম তারা অনেকে ময়মনসিংহের করটিয়ায় সৈয়দ বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার এক সহোদরও প্ল্যানটিকে সমর্থন করল। এই সৈয়দ বাড়ি হচ্ছে আমার সেজো ভাইয়ের শ্বশুরালয়।

আনুমানিক ১২টার দিকে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমেরিকান দম্পতি বব ও ন্যান্সি সিমসন। ন্যান্সি মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার কারণে আমার স্ত্রীর সাথে ভাব হয়। তারা আমাদের তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। আমি ববকে বলেছিলাম যে, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তানি অফিসার। আমাকে পাকিস্তানিরা

মারবে কেন। এর উত্তরে সে জানিয়েছিল যে, সামরিক অফিসার হওয়ার জন্যই আমার বিপদ আরো বেশি। আমি ববকে ভালো করে চিনতাম না। সে USAID-এ কাজ করত। এই সংস্থাকে আমি ভালো চোখে দেখতাম না। তার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলাম না।

২৬ ও ২৭ মার্চের দিনরাতগুলো খুব দুশ্চিন্তায় কেটেছে। হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কোনো লজিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমরাস্ত্রের ব্যবহার যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শেষ অবলম্বন সকলেই জানে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য হত্যাযজ্ঞের পথে নিয়ে যাওয়া কি বিচক্ষণতার লক্ষণ? আমি নিজেই তো একজন পেশাজীবী সৈনিক ছিলাম এবং পেশাটিকে সিরিয়াসলি নিয়ে পড়াশুনার চেষ্টা করেছিলাম। পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসনের বেছে নেওয়ার পথে কোনো সফল হওয়ার দৃষ্টান্ত মনে করতে পারলাম না।

১৯৪৩ সালের জুন–জুলাই মাসের কথা মনে পড়ল। বোম্বেতে 'গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়া'র শ দুয়েক গজ দূরে 'ধনরাজ' মহল নামক এক ভবনে নৌবাহিনী অফিসারদের মেস ছিল। এটা অনেকটা ট্রানজিট ক্যাম্পের মতো। বহু অফিসারের আনাগোনা হত। কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারী এবং আসাম থেকে পশ্চিমের পাঠান সম্প্রদায়ের সীমান্তের অফিসারদের সাথে মেলামেশা হত। কথায় কথায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও মানুষ নিয়ে হাসি-তামাশা হত। যেমন–আড্ডায় আমি প্রবেশ করলেই বলত যে, 'আসুন আসুন বাঙালি বাবু, আমি তোমায় ভালবাসি'। পাঞ্জাবিদের চিহ্নিত করা হয়েছিল 'All brawn and no brain' হিসেবে। ১৯৭১ এর ২৬/২৭ মার্চ উপলব্ধি করলাম '৪৩–এ পাঞ্জাবিদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কারণ বিভীষিকাময় এই হত্যাযজ্ঞের সিদ্ধান্ত সামান্য বুদ্ধিরও কোনো মানুষ নিতে পারে না।

আমার পরিবারের আরেকটা সমস্যা ছিল। আমরা আনুমানিক পাঁচ শ বছর যাবৎ নদীয়া জেলার চাকদাহ নামক এলাকায় বসবাস করে এসেছি। পরিবারের যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং অঞ্চলের লোক সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। আনুমানিক ৫০ পরিবার একত্রে একই জায়গায় একই সীমানায় বসবাস করত। তাদের খাওয়া থাকার অভাব ছিল না। কিন্তু ভারত বিভক্তির পর পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায় এদের হত্যা করার হুমকি দেয় এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করতে বলে। তারা সকলে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে ঢাকা জেলার জয়দেবপুর নামক থানা এলাকায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। ভারতীয়রা ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বিশ্বাসী। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। ২০০০ সালে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে ব্যতিক্রমধর্মীদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে।

১৯৭১

আমাদের পরিবারের সমস্যা হল যে আমরা ভারতে গিয়ে তো আশ্রয় নিতে পারি না। তা হলে ২৫ মার্চ যে যুদ্ধ শুরু হল তা দেশের মধ্যে অবস্থান নিয়েই করতে হবে। কিন্তু

কোথায় যাব? আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বা ইস্ট বেঙ্গলের বিদ্রোহী সেনাবাহিনী কি কোনো মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছে? শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী এবং কন্যা নায়লা ও লুবনাকে করটিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

২৫ মার্চ ১৯৭১–এ সন্ধ্যায় জনাব মোহাম্মদ তোহা ও বদরুদ্দীন উমর আমার সাথে দেখা করতে এসে ফেঁসে যান। তারা বাড়ি ফিরতে পারেন নি। এরা দুজনে ২৭ মার্চ দুপুরে তাদের নিরাপদ ঘাঁটিতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ২৭ মার্চে সকলের মুখে শুনতে থাকি হানাদার বাহিনীরা যুব সম্প্রদায়ের উপর খুবই ক্ষিপ্ত এবং এই সম্প্রদায়কে বেছে বেছে উঠিয়ে নিয়ে মেরে ফেলছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মেজর আমিনেরও ১৮/২০ বছরের একটি ছেলে ছিল যে তার প্রতিভার পরিচয় সবে দিতে শুরু করেছিল। আমিনেরও সমস্যা একই। তাই দুজনে ঠিক করলাম যে আমার ১৫ বছরের ছেলে নদিম ও আমিনের ছেলে চিংকুকে তোহা ও বদরুদ্দীন উমর সাহেবের হাতে সঁপে দেব।

এই দুই কিশোরের নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার কাহিনী বর্ণনা আমি এখানে দিচ্ছি না। শুনেছি বদরুদ্দীন উমর এ সংক্রান্তে আগে সামান্য কিছু লিখেছিলেন এবং আবারো লিখবেন বলে জানিয়েছেন।

২৮ মার্চে আমার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়কে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে করটিয়ায় পাঠিয়ে দেই। আমার ছেলে নদিম নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছে উর্দুওয়ালা বলে চিহ্নিত হয়, জান নিয়ে কোনোমতে বাড়ি ফেরে। নদিমকে আমি ২৮ মার্চ করাচিতে অবস্থানরত আমার মেজো ভাইয়ের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করি।

ভাসানী ন্যাপের নেতা সাঈদুল হাসানের সাথে আমার ভালো পরিচয় ছিল। আমার পরিবারের সমস্যা তিনি জানতেন। করটিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তবে আমার পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তিনি আমাকে আমার বাড়িতে থাকতে না দিয়ে নিজ বাসভবনে নিয়ে যান। এখানে থাকার সময়ে শফিউল্লাহর বাহিনীর খোঁজখবর নিতে থাকি এবং করটিয়া হয়ে টাঙ্গাইলে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে ২৯ মার্চ রাত্রিটি আমি করটিয়ায় পরিবারের সাথে কাটাই।

করটিয়ায় ১০/১২টি পরিবারের সাক্ষাৎ পেলাম। সকলেই শহরে বিপদ দেখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে এখানে এসেছিল। ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। আমি আমার পরিবারকে সেজো ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের খোঁজে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করি। কেউ বাধা দেয় নি।

শফিউল্লাহর সাথে যোগদান সম্বন্ধে লেখার আগে করটিয়ার একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। এটি ঘটে আমার প্রস্থানের দু-চার দিন পরেই। হানাদার বাহিনীর একদল জয়দেবপুর হয়ে ময়মনসিংহ যাওয়ার চেষ্টা করছিল। করটিয়ায় এসে তারা স্থানীয় জনগণের ব্যারিকেডের সম্মুখে পড়ে। ঘটনাটা আমি আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছিলাম। তার কাছে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না এবং সে এ বিষয়ে কোনো দিন লিখবে না।

হানাদার বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এলোপাতাড়ি অজস্র গুলিবর্ষণ করতে থাকে রাস্তার আশপাশে বসতিকে লক্ষ্য করে। তারা মর্টারও ব্যবহার করেছিল। দুএকটি মর্টারের বোমা সৈয়দ বাড়ির আশপাশে পড়াতে সৈয়দ বাড়িতে আশ্রিতদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এদের অধিকাংশই এই স্থান ত্যাগ করে দূরবর্তী গ্রামে পালিয়ে যেতে শুরু করে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের লক্ষ্যে নয়। যে যেমন পারে যেদিন পারে ছুট দিয়েছিল। আমার স্ত্রী-কন্যারাও এদের মধ্যে ছিল। পথিমধ্যে একটি খালও ছিল। সেই খাল যে তারা কীভাবে পেরিয়েছিল বলতে পারে না। জান বাঁচাবার জন্য যখন ছুট দেওয়া, তখন স্ব-স্ব প্রাণ বাঁচাবারই চেষ্টা থাকে। তা ছাড়া ছোট-বড়দের মধ্যে ও ছেলেমেয়েদের মাঝে ছুটবার ক্ষমতাও বিভিন্ন। এরকমভাবে পালাবার কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রী যখন মনে করল যে, সে একটি নিরাপদ জায়গায় এসেছে তখন সে পেছন ফিরে তার মেয়েদের খোঁজ নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের দুজনকে কোথাও দেখা গেল না। অন্যরাও এই মেয়ে দুটো সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না। অবশ্য ঘণ্টা দুয়েক পরে তারা সবাই একত্রিত হয়েছিল পার্শবর্তী গ্রামে।

ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যুদ্ধ কী এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করে তা বোঝানোর জন্য। সকলে সর্বপ্রথমে তার প্রাণকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এরকম বহু পরিস্থিতি দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের দু দিনের মধ্যে আমার নৌ–জাহাজ Port Sweetnam পৌঁছে ছিল। সেখানে অবতরণ করে আমার সঙ্গে এক শিখ ভদ্রলোকের দেখা হয়। সে হিন্দি ভাষা জানত। তার মুখে শুনলাম জাপান সৈন্যরা Retreat করে সিঙ্গাপুরে যাবার সময়ে স্থানীয় লোকদের উপর অমানবিক অত্যাচার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় লোকেরা বনে-জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাতে থাকে। শিখ ভদ্রলোক শোকগ্রস্ত কণ্ঠে জানালেন যে, তার পরিবারকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। আমার স্ত্রীর অবস্থাও একই রকম ছিল। যুদ্ধ যে কী ভীতিকর ব্যাপার এবং এর ভয়াবহতা বেসামরিক জনগণের উপরে বেশি পড়ে, তা সামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আদৌ মনে রাখে না।

১৯৭১

৩০ মার্চ আমি করটিয়ার সৈয়দ বাড়ির মালিক শফিক সাহেবের সাহায্যে একটি জিপের বন্দোবস্ত করি আমাকে টাঙ্গাইলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরোহীদের মধ্যে আমার খালাতো ভাই স্থপতি মাজহারুল ইসলামও ছিলেন। পথিমধ্যে জনসাধারণ আমাদের জিপ অনেকবার থামিয়েছিল সর্বশেষ খবর জানবার জন্য। আমরাও নিজের থেকে কয়েকবার জিপ থামিয়েছিলাম। সড়কের আশপাশে দেখছিলাম ছোটখাটো বিভিন্ন ধরনের যুবকেরা হাতে লাঠি নিয়ে লেফট রাইট করে প্যারেড করছে। প্যারেডের পরিচালকরা ছিল বিভিন্ন বয়সের এবং বেশিরভাগই প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও পুলিশের সদস্য। আমি একজন সামরিক অফিসার জানতে পেরে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার পদ্ধতি ও পন্থা সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসা করছিল। আমি ব্যারিকেড সৃষ্টির পক্ষে ছিলাম না। ব্যারিকেড কার্যকর করার জন্য এর আশপাশে অস্ত্রধারী সৈন্যদেরই প্রয়োজন পড়ে। অন্যথায় এই বাধা প্রতিপক্ষ সহজেই সরিয়ে ফেলে স্থানীয় লোকদের উপর নির্যাতন করে।

টাঙ্গাইলে পৌছে জানতে পারি যে, দুএকদিন আগেই শফির ব্যাটেলিয়ান ময়মনসিংহে চলে গেছে। অতএব সেখানে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ময়মনসিংহ পৌছাতে আমাদের দুপুর দুইটা আড়াইটা বেজে গেছে। শহরে প্রবেশ পথে কোনো লোকজন দেখতে পাই নি। মনে হচ্ছিল শহরটি নীরব নিস্তব্ধ। সৈন্যদের খোঁজ করায় কোনো একজন লোক শহরের একটি সড়ক ও ভবনের নাম করে। এখানে পৌছে কোনো সৈনিকের সন্ধান না পাওয়াতে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ঢুকে দেখি তারা FSMO পরেই সটান শুয়ে রয়েছে। সকলকে ক্লান্ত বলে মনে হল। মেজর শফিউল্লাহর নাম উল্লেখ করায় তারা পার্শ্ববর্তী আরেকটি ভবনের নাম জানাল। জিপ নিয়ে আবার সেখানে গেলাম। এটি ছিল ময়মনসিংহ টিচার ট্রেনিং ভবন। এর দ্বারপ্রান্তে প্রহরারত এক সৈনিককে দেখলাম। আমার পরিচয় দিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। সে প্রত্যাখ্যান করল। তখন আমি ছোট্ট একটি কাগজে আমার নাম পরিচয় দিয়ে এটি শফি সাহেবকে পৌছে দিতে বলি। বেশ কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার বেরিয়ে আসলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যেতে রাজি হলেন কিন্তু অন্যান্য আরোহী ও জিপ যেতে দিলেন না। অতিরিক্ত সতর্ক ও সাবধানতায় মনে খটকা লাগল।

দোতলা বিরাট একটা বারান্দায় সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের দু-চার জন অফিসারের সঙ্গে দেখা হল। মেজর শফিও সেখানে ছিলেন। বারান্দায় একটি বড় টেবিলে আহারাদি সাজানো ছিল। শফি আমাকে দেখে যেমন আশ্চর্য হল তেমনি খুশিও হল। কথাবার্তার প্রথম পর্যায়ে একসময় সে আমাকে তার ব্যাটেলিয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। বুঝলাম এটা ছিল সৌজন্যমূলক অনুরোধ। আমি উত্তরে বলেছিলাম যে, তোপখানার এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তোমার ব্যাটেলিয়ানে পদাতিক সৈন্য হিসেবেই কাজ করতে এসেছি।

আমার জিপ ও সঙ্গীদের ভিতরে আসার অনুমতি চাওয়ায় সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কারণে অনুরোধ করল জিপটা ভিতরে নিয়ে না আসতে। অনুভব করলাম যে তাদের মধ্যে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং হতে পারে তারা মানসিকভাবে সে মুহূর্তে কিছুটা দুর্বল ছিল। কোনো একজন অফিসার বলে উঠল তাদের সামনে দুটি পথ আছে, যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়া বা হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গিয়ে বিদ্রোহী হিসেবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা। তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে তারা সকলে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত তবে ময়মনসিংহের ডিসি তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এরকম কথাবার্তা হওয়ার সময় শফি ও তার অফিসারদের রাস্তায় রাস্তায় যুব সমাজের প্যারেডের কথা বললাম এবং আরো বললাম যে, দেশবাসী আজ তাদের নেতৃত্বের আশায় পথ চেয়ে আছে। মনে হল তারা আশ্বস্তবোধ করল যে, তারা একলা নয়, জনগণ তাদের সাথে আছে।

ময়মনসিংহ এসে শফি স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ায় ব্যস্ত ছিল। পাকিস্তানি বিমানের হামলার বিপদ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর শফি ম্যাপ বের করে তার নেওয়া প্ল্যান ব্যাখ্যা করল। শুনে খুব খুশি হলাম যে তারা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার কারণে নিরাপদ ময়মনসিংহে আশ্রয় নেয় নি। ব্যাটেলিয়ান থেকে একটি কোম্পানি পাঠানো হয়েছিল তেজগাঁও বিমানবন্দরের উত্তর-পূর্বে অবস্থান নিয়ে মর্টার বোমাবর্ষণ করার জন্য। এটা আমার মনঃপূত হয় নি। বিরূপ মন্তব্য করা আমার অন্যায় হত কারণ কোম্পানিটি ইতোমধ্যে লক্ষ্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে বিমানবন্দর আক্রমণ না করে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী তীরে গোদনাইল পেট্রল ডাম্পে আক্রমণ চালানোর ব্যবস্থা নিতে পারলে আরো ভালো হত। কারণ পেট্রল এতে আমদানি ও সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত ডাম্প বিনষ্ট করতে পারলে বিমান, ট্যাংক সেনাবাহিনীর যানবাহন চলাচলে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটত। তবে তখন আর কিছু করার ছিল না।

ময়মনসিংহে শফির বাহিনীর সাথে কয়েক রাত কাটিয়েছিলাম। এখানে থাকাকালীন ডিসির সাথে সাক্ষাৎ হয়। আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতাকেও শফি ডেকে পাঠিয়েছিল। ভারতের সাথে যোগাযোগের বন্দোবস্তের পরামর্শ তার সাথে হয়েছিল। শফি তাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে পাঠাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল।

শফি বোধহয় আমি সেখানে পৌছানোর পরের দিনই ভৈরব বাজারে অবস্থিত তার একটি কোম্পানির পরিদর্শনে যায়। আমাকেও সঙ্গে নেয়। রাতের অন্ধকারে একটি ইঞ্জিন ও বগিতে কোনো লাইট ব্যবহার না করে রওয়ানা হয়েছিলাম। এই বহরটি কোথাও থামবার কথা ছিল না। তবে রেলওয়ের টেকনিক্যাল কারণে অন্ধকারময় দুএকটি স্টেশনে থামতে বাধ্য হয়।

ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, আমাদের যাত্রার গোপনীয়তা বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরও যে দুটি জায়গায় আমাদের বহর থেমেছিল সেখানে মনে হল অগণিত লোকের সমাবেশ হয়েছে। বারবার তারা জয়বাংলা ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। স্টেশনে ও ট্রেনের কামরায় কোনো আলো ছিল না। তা সত্ত্বেও আগন্তুকেরা নিজেদের উদ্যোগে বস্তা ও পোঁটলা ভরা সামগ্রী আমাদের কামরায় ছুড়ে দিতে লাগল। পরে দেখা গেল এগুলো চাল, মুড়ি, গুড়, লাউ, কুমড়া ইত্যাদিতে ভর্তি ছিল। কেন এসব উপহার, কেন জয়বাংলার ধ্বনি রাতের অন্ধকারে তুলেছিল? এতে কি বোঝা যায় না দেশের জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? ঘটনাটি আমাদের সবাইকে অভিভূত করে এবং প্রেরণা যোগায়।

আমরা ভৈরবে পৌছাই বোধহয় ৮/৯টায়। স্টেশন ছিল জনশূন্য। জানতে পারলাম স্টেশন মাস্টার একজন বিহারি, তবে তিনি নাকি স্বপক্ষের লোক। এ ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি। দুপুরের দিকে পাকিস্তানি এক জঙ্গি বিমান আমাদের মাথার উপর উড়তে থাকে। একপর্যায়ে dive দিয়ে আক্রমণাত্মকভাবে স্টেশনের দিকে আসতে থাকে। শফি স্টেশনের

শেষ থাম্বায় গিয়ে তার চাইনিজ রাইফেল নিয়ে অবস্থান নেয়। আমি অস্ত্রবিহীন থাকায় দুই মালগাড়ির মাঝে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে শফিকে দেখতে থাকি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে প্লেনটি নিশ্চয় আমাদের ট্রেনে বোমাবর্ষণ করবে এবং শফিও চেষ্টা করবে প্লেনটিকে ভূপাতিত করতে। শেষ পর্যন্ত বিমানটি বোমা ফেলে নি। শফিও গুলি চালায় নি।

এসময় আরেকটি দৃশ্য দেখলাম। শফির কোম্পানিটি আনুমানিক হাজার গজ দূরে বসতি এলাকায় অবস্থান নিয়েছিল। পাকিস্তানি জঙ্গি বিমানটি যখন স্টেশন আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছিল, তখন এই বসতি এলাকা থেকে প্রচুর এবং অনাবশ্যক গোলাগুলি হতে শুরু করে। শফি তাদের গোলাগুলি বর্ষণ থেকে বিরত থাকার ইশারা করে থামাবার চেষ্টা করে। এটি তার ক্ষোভেরই প্রকাশ। পরে দুঃখ করে আমাকে বলেছিল যে, এভাবে অযথা গোলাগুলি নষ্ট করলে কোম্পানির লড়াইয়ের আর ক্ষমতা থাকবে না। তার মন্তব্য যথার্থ ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম এই কোম্পানির সদস্যরা battle trained নয়। এসব সদস্য নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে পাকবাহিনীর সাথে কীভাবে মোকাবিলা করব।

ময়মনসিংহে থাকাকালীন শফির সাথে আমি কিশোরগঞ্জে যাই। এখানে শফির একটি ছোট বাহিনী ছিল। শফি তাদের সাথে এবং স্থানীয় পুলিশ-আনসার সদস্যদের সাথে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিল। এখানকার তৎকালীন SDO সক্রিয়ভাবে 'বিদ্রোহী'দের সাথে সহযোগিতা করেন। আমাদের কর্মস্থলে কয়েক ডজন বাক্সভর্তি কারেন্সি জমা থাকতে দেখি। কিশোরগঞ্জে আমি অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য দেখি। ৪/৫ জন যুবক ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে কিশোরগঞ্জে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ে তারা হচ্ছে–বাদল, সামাদ, বদি ও মাসুদ। ওরা ঢাকা থেকে ২৮ মার্চ পালিয়ে আসে। ওদের মতে সম্ভবত আরো বহু গ্রুপ ঢাকা শহর ছেড়ে আওয়ামী লীগের গোপন আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে বাদলকে আমি ভালোভাবে চিনতাম। সে আমার স্ত্রীর ভাগনে বেলাল বাকীর সহপাঠী ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় পড়ত। এরা সকলেই আমার মতো ঢাকাতে গুজব শুনেছিল যে হানাদার বাহিনী ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আক্রমণ চালাচ্ছে। তাই তারা বহু কষ্টে এখানে পালিয়ে আসে। তাদের অনুরোধ ছিল একটি সশস্ত্র ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা যা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। পরে শুনতে পাই বাদলের দলকে ৪টি রাইফেল ও কিছু গ্রেনেড দেওয়া হয়েছিল। আমি কিন্তু দিতাম না। কারণ ট্রেনিং ব্যতীত অস্ত্রের মূল্য নেহায়েতই কম।

ময়মনসিংহে শফির কাছে মেজর খালেদ মোশাররফ সংবাদবাহক পাঠিয়ে এদের দুটি বাহিনীকে একত্রিত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। এটি অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয় ছিল এবং শফি সময় নষ্ট না করে সদলবলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে খালেদ মোশাররফের হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে চলে যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কিছু সময় থাকাকালে কোনো এক ব্যক্তি আমাকে কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা (শিশু, অবসরপ্রাপ্ত)–এর খবর দেয়। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি সে প্যান্ট-শার্ট ও কাবুলি জুতা পরে ২০/২৫ জন যুবককে প্যারেড করাচ্ছে। সেও আমাকে দেখে খুব অবাক হয় এবং আমার প্ল্যান জানতে

চায়। আমি তাকে আমাদের গন্তব্যস্থান তেলিয়াপাড়াতে যেতে অনুরোধ করি। আমরা ঠিক করলাম সকলে মিলেমিশে কাজ করব।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। শফির বাহিনীর কাছে আমি ছিলাম একজন অতিথি। শফি ও তার অফিসারবৃন্দ আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছিল। আমাদের মধ্যে কিছু আলোচনা হত, কিন্তু আমার সাথে এদের সম্পর্কের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত কিছু জড়তা ছিল, এটা স্বাভাবিক।

তেলিয়াপাড়াতে শফি আমাকে খালেদ মোশাররফের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটা আমাদের প্রথম পরিচয়। আমি তাকে দেখে খুব অনুপ্রাণিত হলাম। তবে এই দুই ব্যাটেলিয়ান মিলিত হওয়ার পর শফির সাথে আমার সম্পর্ক কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছিল শফি ও খালেদ আমাকে ফেলতেও পারছিল না গিলতেও পারছিল না।

এই চা বাগানে আমার সাথে ব্রিগেডিয়ার পান্ডের দেখা হয়। বিবিধ আলোচনার মধ্যে ২৫ মার্চের পর গণঅভ্যুত্থানের স্বরূপটা কী সেই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। পান্ডের কাছে বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানতে চাইছিলেন যে, ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর সেনা, পুলিশ, আনসার ইত্যাদি বাহিনী কি কেবল আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে পালিয়ে এসেছে। নাকি এটি স্বাধীনতার জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। এর উত্তর তিনি নিজে সঠিক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তবে শত শত যুবক স্বপ্রণোদিতভাবে তেলিয়াপাড়ায় স্রোতের মতো আসছিল। তাদের দাবি ট্রেনিং ও অস্ত্র। এই যুবকদের সংখ্যা এত বাড়ছিল যে, তাদেরকে একপর্যায়ে নিজ স্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবং কয়েক সপ্তাহ পর ফিরে আসতে বলা হয়েছিল।

একদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার পান্ডে তার জিপ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। উভয়ে জিপে করে ৫/৭ মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ি। স্থানীয় জনগণ আমাদের জিপটিকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করিয়ে তাদের মনের কথা খুলে বলে। সবারই মধ্যে ছিল যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা এবং অস্ত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা। সুতরাং অভ্যুত্থানের স্বরূপটি পান্ডেকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের যে সূচনা হয়েছে তা সে বুঝতে পারল।

তেলিয়াপাড়ার ছোট্ট একটি ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। মেঝেতে শুয়ে থাকা অবস্থায় সকালে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেস বেয়ারা চা দিয়ে যায়। সকালে দৈনন্দিন কাজ সেরে এসে বিছানা গুটাতে গিয়ে দেখি আমার বালিশের তলা থেকে কেউ আমার ঘড়িটি নিয়ে গেছে। এই দুঃসময়ে আমরা যখন সকলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত তখন কোনো এক সৈনিকের এরকম প্রবৃত্তি আমাকে নিরাশ করে।

তেলিয়াপাড়ায় পৌছার পর আমার সাথে শফির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে তার ব্যাটেলিয়ান এবং খালেদ মোশাররফকে নিয়ে ব্যস্ততায় পড়ে যায়। তবে তার হেডকোয়ার্টারে মেজর নূরুল ইসলামসহ ২/৩ জন জুনিয়র অফিসারের সাথে নানাবিধ

আলোচনা হত। এরা সবাই ছিল হতাশাগ্রস্ত। পরিবার প্রসঙ্গ আসত না। ভবিষ্যৎ নিয়ে এদের চিন্তা ছিল বেশি। মেজর নূরুল ইসলাম ও আরো ২/১ জন জুনিয়র অফিসার যাদের চেহারা মনে পড়ে কিন্তু নাম মনে পড়ে না, তারা বলাবলি করত যে গেরিলা যুদ্ধের পন্থা অবলম্বন করাই হবে শ্রেষ্ঠ পথ।

সম্ভবত এপ্রিলের ৩ তারিখে কে একজন আমাকে জিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এর আগে আমি তাকে দেখি নি। দাড়ি গজিয়ে থাকলেও তাকে বেশ স্মার্টই দেখাচ্ছিল। ২৬ মার্চে তার বেতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। সে কিন্তু নীরব থাকে। কুশলাদি আদান-প্রদানের পর তার বাহিনীর অবস্থান জানতে চায়। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে জড়তা থাকায় সে খুবই সংক্ষেপে দু-চারটি কথা বলল। খালেদ মোশাররফের আচরণ ছিল খোলামেলা ও হাসিখুশি। আর জিয়া ছিল একটু গম্ভীর প্রকৃতির। খালেদের মতো সেও আমাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি।

তেলিয়াপাড়াতে তৎকালীন তোপখানার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের সাথে আমার দেখা হয়। সে কিন্তু আমাকে মার্চের ২০ থেকে নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির বহু ঘটনার বিবরণ দেয়। তার সরলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করে। এসবের বিবরণ সে নিজেই তার প্রকাশিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছে। তার একটি বিশেষ কথা বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিল, সেটা হচ্ছে—মেজর জিয়া ২৫ মার্চের রাত অবধি তার সাথে তেমন সহযোগিতা করে নি, ২৫–এর রাতে সে জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং জিয়া 'বিদ্রোহী' সেনাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র থাকায় তাকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যবস্থা করেছিল। তবে এই প্রচার কোথা থেকে কখন কী ভাষায় দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয় নি এবং এটা আমি দরকারও মনে করি নি।

তেলিয়াপাড়া চা বাগানে একদিন আকস্মিকভাবে কর্নেল ওসমানীর আবির্ভাব হয়। তিনি জানালেন যে একজন বাঙালি 'সিগন্যাল কোর'-এর অফিসারের সাহায্যে নদী পেরিয়ে তিনি ভারতে এসেছেন। কাহিনী বলতে তিনি নিজেই তার মোচের কথা উল্লেখ করলেন। তাকে জনসাধারণ না চিনলেও তার মোচকে চিনতে পারবে এই আশঙ্কায় তিনি তার গোঁফে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছিলেন। রসিকতার সাথে এটা বললেও আসলে কথাটা ঠিকই ছিল। আমরাও তাকে চিনতে পারছিলাম না।

সম্ভবত ৪ এপ্রিল ওসমানী সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে অনেকের মধ্যে ছিলেন শফি, খালেদ, জিয়া, রফিক, সাফাত জামিল, নূর ইসলাম এবং কর্নেল রেজাসহ আরো অনেকে। বহু আলোচনার মধ্যে আমার দুটি কথা মনে পড়ে। জিয়ার প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সকল বিদ্রোহী সদস্যদের একত্রিত করে এলাকাটিকে স্বাধীন ও মুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া। এই প্রস্তাবের বেশ সমালোচনা হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে এই এলাকাটিকে কত দিন স্বাধীন ও মুক্ত রাখা যেতে পারে সে প্রশ্ন ওঠে।

ওসমানী সাহেব নিজেও আরেকটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটিকে জিয়ার পরিকল্পনার সমর্থক বলা যেতে পারে। ওসমানী প্রস্তাব দেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে যেসব সেনাবাহিনী হাতে ছিল তাদের সকলের সমন্বয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেওয়া। তিনি বিশেষ করে আমাকে এই অভিযান সফল করার জন্য একটি 'ফায়ার প্ল্যান' তৈরি করতে বলেন। এই প্রস্তাবও ছিল অবাস্তব। কারণ প্ল্যানটি বাস্তবায়ন করার জন্য Logistic support দ্রুত আয়োজন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই প্রস্তাবসমূহের উপর কর্নেল রেজাও কিছু মন্তব্য করেন। সামান্য বাকবিতণ্ডাও শুরু হয় এবং কিছু অস্থিরতা দেখা দেয়। রেজার অবস্থা ছিল আমার মতো। বাহিনী ব্যতীত কমান্ডার হওয়া যায় না এবং সেরকম কমান্ডারের কথার মূল্য গুরুত্ব পায় না।

বৈঠকটি ভালোই চলছিল। আরো কিছু সময় নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হত। ভারতের সহায়তা পাওয়া এবং গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করার ইঙ্গিত থাকলেও এসব বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করার সময় পাওয়া যায় নি। কারণ বাইরে থেকে একজন জুনিয়র অফিসার এসে খবর দিল সিগন্যালের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে পাঁচটি জঙ্গি বিমান চা বাগানে আক্রমণ করতে আসছে। এ খবর পাওয়ার পর অতি শীঘ্রই ওসমানী সাহেব বাগান থেকে অতি দ্রুত প্রস্থান করেন। আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এখন এটুকুই মনে পড়ে যে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে খালেদ ও জিয়া তাদের বাহিনীর অবস্থান দৃঢ় করার পক্ষে ছিলেন এবং শফি ছিল সবচেয়ে কো-অপারেটিভ। সে তার এক কোম্পানিকে জিয়াকে সাহায্য করার জন্য রামগড় অভিমুখে পাঠাতে রাজি হয়।

তৎকালীন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এ সময় অবসর জীবনযাপন করছিলেন। আমি তার খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করি। মাত্র এটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, আমাদের ৪ এপ্রিল বৈঠকের সময় তিনি বসেছিলেন না। বিদ্রোহী পুলিশ, আনসার ইত্যাদি বাহিনীকে একত্রিত করে সিলেটের চা বাগান অঞ্চলে তৎপর ছিলেন। তবে আমাদের বৈঠকে তার কথা কেউ উল্লেখ করে নি। মনে হয় অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের বিড়ম্বনায় কর্মরত অফিসাররা ভুগছিল। সেদিন আমাদের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডাররা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

তেলিয়াপাড়া চা বাগানের আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। শাহবাজপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে দেখা করতে এসে বলেন যে, তাকে অনুমতি দিলে তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন এমনভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন যে আর কেউ তা সহজে মেরামত করতে পারবে না। দরকার হলে তিনি আবার কেন্দ্রটি চালুও করতে পারবেন। এই আলোচনায় আমি ছিলাম সবচেয়ে সিনিয়র। আমি তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ করে ওসমানী সাহেব চা বাগানে এসে খবরদারি জানতে চাওয়ায় একপর্যায়ে তাকে এই অনুমতি প্রদানের কথা উল্লেখ করি। এই তথ্যে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তার কণ্ঠস্বর উঁচু করে আমাদের সকলের উদ্দেশে কয়েক মিনিটের বক্তব্য রাখেন। যার সারমর্ম হচ্ছে যে, বিদ্যুৎ না থাকলে কলকারখানা চলবে কেমন করে? শ্রমিকরা কোথায় যাবে এবং কী খাবে, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, তার গোটা কয়েক মূল্যবান বন্দুক ও রাইফেল তার বাসস্থানে ছিল। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের তাদের 'ফায়ার আর্মস' জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তার এক সিএসপি ভ্রাতুষ্পুত্রকে খবর পাঠিয়েছেন এইগুলো সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। এ কথা শুনে আমরা সবাই খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমি আমার রাইফেল ও পিস্তল সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারার সুযোগ না থাকায় ধানমণ্ডি বাসভবনে মাটির নিচে পুঁতে এসেছিলাম। আমাদের আশ্চর্য লাগল যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের ফায়ার আর্মস দখলকারীদের কাছে জমা দেব কেন? অধিকন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল করে দেওয়ার একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওসমানী সাহেব আমাদের কার্যক্রমে বাধা দিলেন কেন সে মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

শেষ অবধি ওসমানী সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন সেই মুহূর্তে আমার নিজের হাতের লেখা চিঠি পাঠিয়ে শাহবাজপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্র অচল করার নির্দেশ তুলে নেবার অর্ডার পাঠাই। ঘটনা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। মনে হয় এরা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সাথে আপসের অপেক্ষায় ছিলেন। হতে পারে এই মনোভাবে ওসমানী একাই ভুগছিলেন।

চা বাগান থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে যায় তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। আমিও চলে যাই আগরতলায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। আগরতলায় দেখতে পাই বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল বিদেশী বহু নামকরা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি এবং 'ওয়ার করসপন্ডেন্ট'। জাঁদরেল সংস্থা, জাঁদরেল সাংবাদিক। এদের সকলেরই দুনিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা ছিল। অবাক হয়ে গেলাম এরা কেমন করে কীভাবে খবর পেয়ে আগরতলার মতো অজানা এবং দুর্গম অঞ্চলে এত শীঘ্র উপস্থিত হতে পারল। তাদের সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম যে তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলছে এবং খালেদ মোশাররফ এবং সম্ভবত জিয়া ও শওকতের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আমাদের সকলের সিদ্ধান্তহীনতার জন্য তাদের রিপোর্ট লন্ডন, প্যারিস ও ওয়াশিংটন ইত্যাদি জায়গায় পাঠাতে পারছে না। আমাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকার জন্য তারা নাকি তাদের রিপোর্ট প্রেরণ স্থগিত রেখেছে। কেমন করে তারা যেন আমার সন্ধান পায় উপস্থিত সবচেয়ে সিনিয়র আর্মি অফিসার হিসেবে। আমাকে ঘিরে তারা তাদের অসন্তোষের কথা সরবে প্রকাশ করছিল।

আগরতলায় ৪৮ ঘণ্টা থাকার মধ্যে তাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী ২৫ মার্চের পরে বাংলাদেশে যে গণঅভ্যুত্থান হয় তা ছিল অস্বাভাবিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে এটা ছিল একটি জাতীয় অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন। ইস্ট বেঙ্গলের সেনাবাহিনীকে তারা বিদ্রোহী হিসেবে অপমান করতে চায় নি। তারা খুঁজছিল A Government in

exile. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বারবার পীড়াপীড়ি করছিল একটি সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়ার জন্য। কিন্তু এ দায়িত্ব নিতে একটি নেতাও তারা খুঁজে পায় নি। অভিযোগ করল, নেতারা দোদুল্যমান, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। আমাকে পরামর্শ দিল উপস্থিত মিলিটারি অফিসারদের নিয়ে একটি সরকার গঠন করার। তাদের এই আগ্রহ ও সহানুভূতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিষয়টি খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দেই।

মোশতাক সাহেবকে আমি ১৯৩৫ সাল থেকে চিনতাম। সাংবাদিকদের সরকার গঠনের প্রস্তাব মোশতাক সাহেবকে জানাই। বিষয়টিকে তিনি সিরিয়াসলি নিলেও আমাকে জানালেন যে এই সিদ্ধান্ত তার পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। আগরতলায় তাজউদ্দিন সাহেবের আগমনের কথা শোনা গিয়েছে। সকলে সম্মিলিতভাবে তাজউদ্দিনের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তবে তার একটা মন্তব্য আমার মনঃপূত হয়। সরকার গঠন করলে নাকি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সম্পত্তি ও সম্পদ পাকিস্তান সরকার ক্রোক করে নেবে। আমি অবাক হয়ে গেলাম সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার ইত্যাদির সদস্যদের পরিবারের ভাগ্য কী হবে? আমরা কি কেবল বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হব? যা হোক বিদেশী সাংবাদিকদের জানিয়ে দিলাম যে, অতি শীঘ্রই তাজউদ্দিন সাহেবের উপস্থিতিতে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

২

তারিখ মনে না থাকলেও তাজউদ্দিন সাহেব অতি দ্রুত এসেছিলেন। সকাল আনুমানিক ৯–১০টার সময় একটি রুদ্ধ কক্ষে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। সাংবাদিকসহ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করতে থাকি কখন এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য দ্বার খোলা হবে। সভা চলাকালীন সময়ে কক্ষ থেকে আমরা উচ্চ স্বরে তর্ক-বিতর্কের এবং কান্নাকাটিরও আওয়াজ পাই। কান্নাকাটির কী প্রয়োজন ছিল তা কেউই বুঝতে পারলাম না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সভার কক্ষ থেকে আমাদের বলা হল যে, সরকার গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং ঘোষণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যত্র অনতিবিলম্বে দেওয়া হবে। জানি না সেদিনের এই সিদ্ধান্ত বিদেশীরা কীভাবে গ্রহণ করেছিল। এটা জানা কথা যে সাংবাদিকরা তাদের মালিক বা সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট প্রেরণ করে। আগরতলায় কোনো ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে আমি দেখি নি। যে কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছিল তারা সকলে সহজে অনুমান করে নিয়েছিল যে ২৫ মার্চের জনগণের অভ্যুত্থান আদতেই

একটি জাতীয় অভ্যুত্থান ছিল। সম্ভবত কেউই সেদিন এই সত্যকে বিকৃত করে নি। তবে তাদের রিপোর্ট পড়ারও সুযোগ আমার হয় নি।

শফিউল্লাহর ব্যাটেলিয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আমি বেশ বিপদেই পড়েছিলাম। ওসমানী সাহেব কিন্তু আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি আমি কোথায় আছি এবং ভবিষ্যতে কোথায় কীভাবে থাকব। তার সাথে আমার সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৪৮ সালে যখন তিনি কোয়েটাতে (বেলুচিস্তান) স্টাফ কলেজে ছিলেন। তখন বাঙালি অফিসারের সংখ্যা কমই ছিল। তাই সেদিন এই সিনিয়র মেজর সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার পিতা নাকি একজন ও. ঈ. ঝ অফিসার ছিলেন, তিনি নাকি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই আমার সাথে উর্দু, ইংরেজি ও ভাঙা ভাঙা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। ইংরেজিতে ছিল খুব তুখোড় এবং পুরোপুরি ব্রিটিশ কায়দায়। আর আমি কেবল বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে চাইছিলাম।

এই ঘটনাই আমার 'সাব-কনসাসে' থেকে যাওয়ায় তার সাথে আমার সম্পর্ক গভীর হতে পারে নি। তবে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৫৯ সালে তার সাথে আমার আবার দেখা হয় ঐ রাওয়ালপিন্ডিতে, যখন পদাতিক বাহিনীতে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। কর্নেল হিসেবে তিনি মিলিটারি প্ল্যানিং বিভাগে নিযুক্ত হয়ে কাজ করছিলেন এবং এই হিসেবে সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসাররা তাকে যেমন বরদাশত করতে পারত না, তেমনি তাকে গ্রহণ করতেও পারত না। তবে তারা তার বাঙালিত্ব এবং এর বিপরীতে কথাবার্তায়, পোশাকে ও আচরণে ব্রিটিশদের অনুসরণ করাটা নিয়েও মুখরোচক উক্তি করত। ওসমানী সাহেবের সঙ্গে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার ওয়াসেউদ্দিনের বেশ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ওসমানী তখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য কাজ করছিলেন। ওয়াসেউদ্দিন বাঙালি গোলন্দাজ বাহিনী গঠনের পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন।

আগরতলায় বিচ্ছিন্নভাবে থাকার সময় বেশ বিপদেই পড়েছিলাম। থাকা খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। আমার হাতের একটি আংটিও বিক্রি করতে হয়েছিল। এই অবস্থাতে ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনের এক পদস্থ কর্মচারীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ সাহেবের সাথে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। থাকার বন্দোবস্ত তো হল, খাওয়ার অবস্থা কী হবে? স্থানীয় এক মাড়োয়ারি সকাল-বিকাল টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খানা নিয়ে আসত জহুর সাহেবের জন্য। আমি পাশের বিছানায় কিছু পত্রপত্রিকা পড়ার ভান করতাম। আমার এই অবস্থাতেও তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেন নি আমি কোথায় কীভাবে খাওয়াদাওয়া করি। এই অবস্থাতে হঠাৎ একদিন দেখলাম এক বয়স্ক ভদ্রলোক দুটি জিপ নিয়ে আমাদের আস্তানায় সপরিবারে উপস্থিত হলেন। কৌতূহলবশত বেরিয়ে আগন্তুকদের দেখতে গেলাম। এই পরিবারের থাকার ব্যবস্থা আমাদের বাসভবনের অন্য একটি কামরায় করা হয়েছিল।

এরা এসেছিলেন অতি ভারী ১০–১২টি সুন্দর সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এদের মধ্য থেকে হঠাৎ একজন অল্প বয়স্ক মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আপনি জামান দুলাভাই না?' শুনে নির্বাক হয়েছিলাম। বললেন, চিনতে পারলেন না? আমি কহিনুর। পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। এই কহিনুর হচ্ছেন শিল্পপতি এ. কে খানের কন্যা। এই পরিবারের সঙ্গে আমার শ্বশুরালয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কহিনুর আমার দিকে তাকিয়ে আরো বলল যে, আপনাকে দেখতে তো ভালো লাগছে না। কোথায় খাওয়াদাওয়া করেন? আমার এখানে কয়েক দিন থাকেন। যে কয়েক দিন থাকি আপনি আমাদের পরিবারের সাথে খাওয়াদাওয়া করবেন। আমার এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন কর্নেল রব, যিনি তখন আওয়ামী লীগের এমপিও ছিলেন । আগরতলায় বিএসএফ অফিসারস মেসে তিনি আমাকে নিয়ে যান।

উপরোক্ত ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়। তবুও লিখলাম এই কারণে যে সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে সহানুভূতিশীল, সৌহার্দ্য ও স্নেহমমতাময় চরিত্র অতি আবশ্যকীয়। এপ্রিল মাসের দুর্দিনে শত শত যুবক বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন কমান্ডে এসে আশ্রয় নিত ভবিষ্যতে যুদ্ধে যোগদানের জন্য। এদের খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখনো সাব্যস্ত করেন নি। কিন্তু পরে জানতে পেরেছি যে, সেনা সদস্যরা তাদের রেশন থেকেই এদের খাওয়াবার বন্দোবস্ত করত। এই আধপেটা খেয়ে থাকায় যুব সম্প্রদায়ের সাথে সেনাবাহিনীর অতি আস্থাশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কর্নেল রবও ছিলেন আর্মির সদস্য। অধীনস্থদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব তার ছিল। এই কারণে সেদিন আমার বিপদের সময় স্বেচ্ছায় সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। জহুর আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। কিন্তু তার মনে কোনোদিন উদয় হয় নি যে আমার প্রতি তার সামান্য দায়িত্ব রয়েছে।

আগরতলায় বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশের পক্ষে খুব দক্ষ পরিচালনার জন্য এক অস্থায়ী সামরিক দপ্তর গড়ে ওঠে। একাধিক অফিসার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এই দপ্তরের প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছিল। এখানে থাকাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একাধিক সদস্যের সাথে আমার দেখা হয়। তাদের অবস্থা ছিল করুণ। এরা সঙ্গে করে একাধিক যন্ত্রপাতিও এনেছিল। কিন্তু তারা আনতে পারে নি তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারও একদিন এখানে এসে উপস্থিত হন।

বাংলাদেশের এই সামরিক দপ্তরের সাথে ব্রিগেডিয়ার পান্ডেও জড়িত ছিলেন। একসময় ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংও এখানে আসে। আগরতলায় খালেদ মোশাররফের বাহিনীর সাথে পাক বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। প্রতিপক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের আওয়াজ প্রায় ২৪ ঘণ্টাই চলত। এসময় বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমান্ডাররা ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর প্রচণ্ড চাপ দিত অস্ত্র সরবরাহের জন্য। কেননা ইতিমধ্যেই তারা কিছু সংখ্যক যুবককে সামরিক ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশের

অভ্যন্তরে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল। ভারতীয়দের কেবল হ্যান্ড গ্রেনেড ও ছোরা ছাড়া আর কিছুই দেবার ছিল না। আমাদের দাবি ছিল বাস্তবিক। কিন্তু এ দাবি পূরণ করতে না পারাও ছিল বাস্তবিক। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সাহায্য করতে পারা সম্ভব ছিল না।

সম্ভবত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আগরতলায় ওসমানী সাহেব বিভিন্ন কমান্ডারদের সাথে এক বৈঠক করেন। কমান্ডারদের তিনি এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব দেন। ভবিষ্যৎ সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। এই বৈঠকে তিনি আমাকে প্রথমবারের মতো দায়িত্ব দেবার জন্য আসামের তুরাই যাবার প্রস্তুতি নিতে বলেন। কেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। বলেছিলেন বিষয়টি তখনকার মতো গোপন রাখাই ভালো। আলোচনাকালে একসময় তার সঙ্গে কার যেন মতবিরোধ ঘটে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব নিতে বলেন। কথাটি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে তিনি প্রায়শ এরকম পদত্যাগ করতেন। ওসমানী হেডকোয়ার্টার কলকাতায় ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রায় তিনি আগরতলায় আসতেন কয়েক দিনের জন্য। আমি তুরাই যাবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একসময় তিনি আমাকে জানালেন যে, শফিউল্লাহর বাহিনী কর্তৃক সিলেটের ওপর কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তারা পিছু হটছে এবং শফি নিজেও নাকি অন্যত্র খুবই ব্যস্ত ছিল। তৎকালীন ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের কোম্পানি শফিউল্লাহর কমান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওসমানী সাহেব আমাকে অনুরোধ করলেন ক্যাপ্টেন আজিজকে পরামর্শ দেয়ার জন্য, মৌলভীবাজার হয়ে বালাগঞ্জ এলাকায় যেতে।

ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের কোম্পানির সাথে যোগদান করার লক্ষ্যে আমি খোয়াই নদী পার হয়ে সিলেটের মৌলভীবাজার পৌঁছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। তারা আমাকে সার্কিট হাউসে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। মৌলভীবাজারে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের আচার-ব্যবহার, চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্মিত হই। সার্কিট হাউসের নিকটবর্তী একটি টিলার বাসভবনে কেমন করে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল, ডাল, আলু, বেগুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এই ভাণ্ডারের দায়িত্ব কে নেবেন তাই নিয়ে বাকবিতণ্ডার নিষ্পত্তি হচ্ছিল না। তারা সকলে আমাকে মধ্যস্থতা করতে বলেন। এখানে আমার পরিচয় হয় মুনতাকিম চৌধুরী নামক এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে। সত্তরের নির্বাচনে তিনি এখান থেকে এমএনএ নির্বাচিত হন। তার বক্তব্যগুলো আমার ভালো লাগছিল। একপর্যায়ে তাকে আমি এককভাবে আমার সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেই। তাকে আমি জানিয়ে দেই যে আমাকে স্থানীয় এমপিদের বিবাদের মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করা সম্ভব। পাকিস্তানে সেসময় একজন এমএনএ-কে লে. জেনারেলের সমমর্যাদা দেয়া হয়েছিল। আমি তাকে এই অহেতুক বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলি। শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল জানি না। কোনোদিন খোঁজখবর নেই নি।

সিলেট জেলার ঘটনাবলি দিন তারিখ হিসেবে আমার মনে পড়ে না। ওসমানী কর্তৃক আমাকে কোনো লিখিত বা মৌখিক দায়িত্ব বা নির্দেশ দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছিল শফির ব্যাটালিয়নের চার্লি কোম্পানিকে সাহায্য করার জন্য। সিলেটের ডাউকী থেকে নিয়ে সুরমা ব্রিজ পর্যন্ত অনেক দিন যাবৎ নানাবিধ অপারেশন চলছিল। এগুলো আমার মুখে মুখে শোনা। যতটুকু মনে পড়ে সিলেটের এয়ারপোর্টটা নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা চলছিল। সিলেট শহরে যাতে পাকিস্তানি ফৌজ প্রবেশ করতে না পারে সে সম্বন্ধে অর্ডার দেয়া হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ ছিল যে পাকিস্তানিরা যেন সুরমা নদী অতিক্রম করতে না পারে। আমি যখন মৌলভীবাজারে গিয়ে পৌঁছাই তখন চার্লি কোম্পানি সুরমা ব্রিজ থেকে অনেক পেছনে হটে গিয়ে সিলেট–মৌলভীবাজার রাস্তায় অবস্থান নিচ্ছিল।

ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের কাহিনী শুনে আসছি। ইতিহাস পড়েছি এবং এখনো পড়ছি। এখন লক্ষ্য করছি যে, ইতিহাস কীভাবে লেখা হচ্ছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ যাঁদেরকে উল্লেখযোগ্য স্থান করে দিয়েছে, তাঁদের সাথেও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। আলাপ-আলোচনা করেছি, তাদের বক্তব্য–বিশ্লেষণ শুনেছি।

আজ বহুদিন যাবৎ আমার পরিবারবর্গ, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করে আসছেন। একসময় আমিও এমনিভাবে জেনারেল ওসমানীকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে। তিনি লিখব লিখব বলেও শেষ পর্যন্ত সেই ইতিহাস লিখে যেতে পারেন নি। এতদিন পর এবং এই পড়ন্ত বয়সে মনে হচ্ছে যে, আমি বুঝতে পেরেছি, জেনারেল ওসমানী কেন তাঁর ভাষ্য লিখে যান নি?

আমি ইতিহাসবিদ নই। মুক্তিযুদ্ধে আমি যা দেখেছি, শুনেছি বা করেছি তা সব প্রকাশ করা কি ঠিক হবে? এ লেখার প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করতে হবে না? এই লেখাটার কি কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়? '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধ দিয়েই এই দেশ তাঁর স্বাধীন যাত্রা শুরু করে। বহু ঘটনা ঘটে গেছে। এর সবকিছু একত্রিত করলে দেশের মানুষের কাছে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে এর প্রতিক্রিয়া কী হবে? মুক্তিযুদ্ধকে সামান্যতম হেয় করলে নতুন প্রজন্মের ওপর এর প্রভাব কী হবে, সেটাও কি ভাবার বিষয় নয়? আবার সত্য অপ্রকাশিত থাকলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভিত্তি নড়বড়ে রয়ে যাবে। তাই দ্বিধায় ভুগছি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম উপজীব্য করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' নামক এক সমাদৃত গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময় তাঁর মূল পাণ্ডুলিপি থেকে তিরিশটি পাতা বাদ দেওয়া হয় এবং তিরিশ বছর পর নতুন সংস্করণে তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আমার লেখাতে মওলানা আজাদের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না থাকলেও দেশের মানুষের চরিত্র, প্রকৃতি, আচরণবিধি এবং নৈতিকতা, বিবেক ইত্যাদি অনেক সামাজিক বিষয়াদি আছে—

সেগুলো প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কিছুকেই বিশেষভাবে আঘাত করতে পারে, অনেক মূর্তি ভেঙে পড়বে যা স্বাধীন দেশের জন্মমুহূর্তে করাটা অনুচিত বলে মনে করে এসেছি।

১১ সেপ্টেম্বর '৯৬ সকালে ও বিকালে দুটি পৃথক ঘটনা ঘটে—যা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে, আমার নজরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখে ফেলা উচিত। কারণ ইতিহাস বিকৃত হতে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬-এ আমি মিলিটারি হাসপাতালে ছিলাম। এক ভদ্রলোক এসে তাঁর পরিচয় দিয়ে আমার কুশলাদি জানতে চাইলেন। ভদ্রলোককে আমি প্রথমে চিনতে পারি নি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার অধীনে লড়াইয়ের কথা বললেন। পরিচয়ের শেষাংশে আমার পাকিস্তানি BOP-এর ওপর মর্টার নিক্ষেপ করার ভুল আদেশের কথা তিনি অট্টহাস্যে ও সরবে তুলে ধরলেন। সেই মুহূর্তেই আমার কাছে পঁচিশ বছর আগের ১৯৭১-এর ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। এই ভদ্রলোকটিকেই আমি আজ পঁচিশ বছর ধরে সন্ধান করে চলেছি। কিন্তু তাঁর কোনো খোঁজ মেলে নি। খবরের কাগজে বিশেষ মনোযোগ দিয়েই দেখতাম, ইনি কি প্রমোশন পেয়ে কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার বা জেনারেল হয়ে গিয়েছেন কিনা?

'৭১-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে জেনারেল ওসমানী আমাকে মেঘালয়ের তুরা নামক একটি জায়গায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। কিন্তু তার পরপরই বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যে, তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহর ব্যাটালিয়নের চার্লি কোম্পানি পাকিস্তানি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং শফিউল্লাহর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো যোগাযোগ করার সম্ভাবনা না থাকাতে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে এই কোম্পানিকে পরামর্শ দিতে বলেন।

সিলেট-বিশ্বনাথ রোড দিয়ে পিছু হটতে হটতে এই কোম্পানি ফেরিঘাটে অবস্থান নেয়। এখানে হাত ভাঙা এক JCO কে দেখলাম অত্যন্ত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সাথে ফেরিঘাট রক্ষার ব্যবস্থা নিতে। আরো এক ক্যাপ্টেন এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের সঙ্গে দেখা হয়। ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলেছিলাম, কেবল ফেরির রাস্তার ওপর নজর রাখলে চলবে না, ফেরিঘাটের ওপরে ও নিচে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম তীরে পেট্রোলিং করতে হবে এবং কিছুসংখ্যক সেনা সদস্য পিছনে রিজার্ভ হিসেবে রাখতে হবে।

রাত ১২টার পর সংবাদ পেলাম ফেরিঘাটে তুমুল যুদ্ধ চলছে। ক্যাপ্টেন সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় তাকে মৌলভীবাজার পাঠানোর বন্দোবস্ত নেওয়া হচ্ছে। আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই ড্রাইভারসহ জিপ নিয়ে ফেরিঘাটের দিকে রওনা হলাম। ঘটনাস্থলে পৌঁছবার বহু আগে থেকেই প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ বহুদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। আরো নিকটে পৌঁছে দেখি একটি দুটি করে সিপাহি নানাবিধ কারণে স্থান ত্যাগ করে পিছনে চলে এসেছে। ক্লান্ত সৈনিকেরা আমাকে ঘটনাস্থলে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

এই সামান্য কথোপকথনের সময় ফেরিঘাটের মাইল দেড়েক পশ্চিমে কয়েকটি 'ভেয়ারি লাইট' দেখতে পেলাম। সৈনিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঐ স্থানে আমাদের বাহিনীর কোনো সদস্য নেই। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা সফলভাবে নদী অতিক্রম করে অবস্থান নিয়েছে। সেই রাতের অন্ধকারে কোনো গাইড ব্যতীত একাই জিপ ও ড্রাইভারকে পিছনে রেখে আমি সেই হাত ভাঙা JCO-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের তরফ থেকে এত প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ কেন এবং কোন উদ্দেশে হচ্ছে? JCO মাথা চাপড়ে বলল, 'আমি শত চেষ্টা করেও সিপাহিদের গুলি ছোড়া বন্ধ করতে পারছি না।'

যুদ্ধের বর্ণনা দেবার জন্য এ লেখাটি নয়। আসল কথা হচ্ছে, ফেরিঘাটের পতন হল। চার্লি কোম্পানি নতুন অবস্থান নেবার জন্য পিছু হটল। কোথায় কীভাবে অবস্থান নিতে হবে, সেটাও JCO-র সাথে আলোচনা করলাম এবং ফজরের সময় নিজ অবস্থানে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসে দেখলাম চার্লি কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের হাতে পড়েছে; কিন্তু কোম্পানির একটি সেকশনকেও নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে DEPLOY করা হয় নি। তাকে তিরস্কার করাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি JOL কোর্স করেন নি এমন কি Weapons কোর্সও করেন নি। যাই হোক, কয়েকজন JCO ও হাবিলদারের সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করা হল।

এই কাজটি না করেই করা হয়েছিল তড়িঘড়ি করে। ফলে সেনাসদস্যরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। DEPLOY করার পরে আমি লেফটেন্যান্ট সাহেবকে আদেশ দিলাম, জিপে করে এগিয়ে গিয়ে পাক সেনাদের অবস্থান দেখে আসতে। তখন এই ভদ্রলোকটি আমার আদেশ অমান্য করে বললেন যে, এই দায়িত্ব তাঁর দ্বারা পালন করা সম্ভব নয়। তিনি ভয় পান। সেই মুহূর্তে আমি ভীষণ বিস্মিত হই এবং চটে যাই। তাঁর জিপটা ছিনিয়ে নিয়ে আমি একাই ড্রাইভিং সিটে বসে পড়লাম। তখন আমার জিপের সামনে একজন যুবক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আমি কখনোই আপনাকে একা যেতে দেব না।'

এই যুবকের আসল নাম ছিল জাকির খান চৌধুরী। তিনি ছিলেন এক বিদেশী ব্যাংকের অফিসার। তাঁর কোনো সামরিক ট্রেনিংও ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং এরশাদের আমলে একজন মন্ত্রী হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জাকিরের পরামর্শ আমাকে অবাক করে। জিজ্ঞাসা করলাম—জিপ চালাতে পারবে কি না? পরে তিনি আর আমি প্রায় মাইল দেড়েক পাকা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে একটি অবস্থানে পৌঁছে জিপটা একটি গাছের আড়ালে রেখে এবং সামান্য কয়েক পা এগিয়ে দূরবীনের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় আধঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম। তাদের সংখ্যা দেখে অনুমান করলাম যে সৈন্য সংখ্যা এক কোম্পানির মতো। আবার পিছন ফিরে এসে চার্লি কোম্পানির সিনিয়র সদস্যদের বললাম যে, কোনো ভয়ের কারণ

নেই, শত্রু সংখ্যা তেমন বেশি নয়, ঠিকমতো অবস্থান নিলে তাদের অগ্রগতি রোধ করা যাবে। তাদের অনেক আশ্বাস দিলাম এবং সেকশনসমূহের অবস্থান কিছু পরিবর্তন করে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য পরামর্শ দিলাম। আরো বললাম যে, আওয়ামী লীগ এমপি মানিক চৌধুরীর অধীনে অনেক সশস্ত্র যুবক রয়েছে। তাদের সাহায্য নিয়ে ডিফেন্স আরো জোরদার করা যাবে।

সেদিনই প্রত্যুষে আমাকে খবর পাঠানো হয়েছিল যে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা কেন্দ্রে রয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তদারকি শেষ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর কাছে শুনতে পেলাম আওয়ামী লীগ এমপি মহোদয় তাঁর বাহিনী নিয়ে কোথায় অবস্থান করছেন তা তাঁর জানা নেই। সেই দিন বিকালে ব্রিগেডিয়ার পান্ডে এবং আমি চার্লি কোম্পানির অবস্থান পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পড়ি। মৌলভীবাজার পৌঁছবার আগেই দেখি জিপে করে কোম্পানির লেফটেন্যান্ট সাহেব আমাদের দিকেই আসছেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, চার্লি কোম্পানি বিনা সংঘর্ষেই তাদের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পিছু হটেছে। আমরা দুজনে অবাক হয়ে গেলাম, কোথায় অবস্থান নিয়েছে সে খবরও লেফটেন্যান্ট সাহেব দিতে পারলেন না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব JCO-দের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

ব্রিগেডিয়ার পান্ডে এবং আমি চার্লি কোম্পানির নতুন অবস্থা দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং লেফটেন্যান্ট সাহেবকে বললাম আমাদের পথ দেখাতে। তিনি জিপ চালাতে থাকলেন পাঁচ মাইল স্পিডে। তখন আমি ক্ষেপে গিয়ে তাকে আমাদের অনুসরণ করতে বললাম। যুদ্ধের বর্ণনা এখানেই শেষ করি। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, চার্লি কোম্পানির দ্বারা মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গলকে কিছু দিনের জন্য শত্রুমুক্ত রাখা আর সম্ভব হবে না, তা বুঝতে পারলাম।

এখন আমি গত ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সিএমএইচে সকাল ১১টার কথায় ফিরে আসি।

লেফটেন্যান্ট সহেব বললেন, তিনি ১৯৭৫ সালে অবসর নিয়ে এখন এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়েছেন। বনানীতে বসবাস করেন। তাঁর নিজস্ব বাড়ি থেকে আশি হাজার টাকা মাসিক ভাড়া পান। তাঁর পেট্রল পাম্পও রয়েছে। তিনি নাকি ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক আলোচনাও করেছেন।

প্রথমেই বলেছি তাঁকে আমি চিনতে পারি নি। তাঁর পরিচয় বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল যার কিছু বর্ণনা এখানে দিলাম। বললাম—'তুমিই সেই লেফটেন্যান্ট? যে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে? আর তোমার জায়গায় জাকির খান চৌধুরী আমার সাথে এগিয়ে এসেছিল।' এই কথা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে হাসপাতালে আমার আঠার নম্বর কক্ষ থেকে বিশেষ জরুরি কাজের অজুহাতে প্রস্থান করলেন। এই ভদ্রলোককেই আমি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে খুঁজছি। মুক্তিযুদ্ধে এর মতো উর্দি পরিহিত কাপুরুষ আমি আর কাউকে দেখি নি। তাঁর কাছে

আমার আরো প্রশ্ন ছিল। বিশেষ করে জানতে চেয়েছিলাম তিনি কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখছেন বা লিখেছেন কি না এবং তাঁর বীরত্বের জন্য কোনো পুরস্কার পেয়েছেন কি না?

ঘটনা শেষ এখানেই নয়। সেদিন রাতে চার্লি কোম্পানির কমান্ডার আহত ক্যাপ্টেন কয়েক দিন পরে আগরতলা হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত এক ডাক্তার আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'স্যার এটি একটি কোর্ট মার্শালের কেস।' ক্যাপ্টেন সাহেব SELF INFLICTED INGURY তে ভুগছেন। আমি ডাক্তার সাহেবকে মিনতি করলাম যে, বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলে আমাদের বড় রকম ক্ষতি হবে। যুদ্ধের শুরুতেই কাপুরুষতার ঘটনা জানাজানি না হওয়াই ভালো। শুনতে পেয়েছি, সেই ক্যাপ্টেন সাহেব নাকি বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন এবং তিনি এখন একজন জেনারেল।

আগেই বলেছি, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে দুটি ঘটনা ঘটে। একটির বিবরণ কিছুটা লেখা হলো। সেদিন বিকালেই হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে শুনলাম, একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি বাড়িতে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট আগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। আমি আসার পর গেটে দারোয়ানের কাছে আমার ফিরে আসার খবর পেয়ে লোকটি পুনরায় আসেন।

আমি তাঁকে আদৌ চিনতে পারি নি। পঁচিশ বছর পর তাঁর সাথে দেখা। বিসিক-এ সামান্য একটি চাকরি নিয়ে এতদিন তিনি ঢাকার বাইরে ছিলেন। ঢাকায় এসেই আমার সাথে দেখা করতে আসেন।

পরিচয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম, যুদ্ধকালে কুষ্টিয়ার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। একটি খুসরুঠ উড়িয়ে দেওয়ার অপারেশনে সে অংশ নিয়েছিল। আরেকটি অপারেশনে পাকিস্তানে কর্মরত থানার এক অত্যাচারী অফিসারকে ধরে নিয়ে এসে আমার ক্যাম্পে উপস্থিত করেছিল। আমি নাকি তাঁর খুব প্রশংসা করেছিলাম এবং তাঁর নিজের কথায় অনেক 'আদর' করেছিলাম। সেই কথাই স্মরণ রেখে সে আমাকে দেখতে আসে। এখন আমার কাছে সে কিছু পাবার জন্য আসে নি। কেবল একবার দেখবার ইচ্ছা পূরণের জন্য সে এসেছে।

আমি তো এই ফজলুল হক নামক ছেলেটিকে মনে রাখি নি। ফজলুল হকের মতো বহু সাধারণ ছেলেই সেদিনের স্বাধীনতাযুদ্ধে অকল্পনীয় সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা আজ সবাই কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে তাঁদের বীরত্বের কথাগুলো লিখে রাখবার সময়ও আমি পাই নি। আজ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কাদের কথা লিখব? মুক্তিযুদ্ধের দাবি নিয়ে যারা রাজনৈতিকভাবে বা ব্যবসায়িক মহলে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেককেই আমি চিনি। তাদের কথা লিখতে গেলে মুক্তিযুদ্ধকে অসংলগ্ন করা হবে। যাঁদের কথা লিখতে চাই, তাঁরা কেবল হারিয়েই যান নি, দেশ ও মানুষের কাছে কোনো স্বীকৃতিও পান নি। এই দাবিও তাঁরা কোনোদিন করেন নি। তাঁরা ইতিহাস কিংবা নিজেদের ঘটনাবলিও লিখছেন না, তাঁদের

লিখবার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছাও নেই। এ কাজটি আমার করা উচিত ছিল। আমার ক্লান্তি, অলসতার জন্যই সেদিন তাঁদের কথা ডায়েরিতে লিখতে পারি নি। আমার এ অপরাধ আজ ক্ষমাহীন। তাই ভাবছি আজ পর্যন্ত যেটুকু স্মৃতি আমি ধারণ করে চলেছি, সেটুকু লেখা উচিত।

সত্যের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হোক। অজানা অসংখ্য নরনারী, যারা মুক্তিযুদ্ধকে অন্তঃকরণ থেকে সমর্থন করেছিল, যারা কোনো পুরস্কার বা স্বীকৃতির কথা চিন্তা না করে তাদের সর্বস্ব দিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং বলা যায় যাদের প্রচেষ্টায় এই দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের সম্বন্ধে যতটুকু মনে পড়ে সেগুলো লেখা উচিত। এরই সঙ্গে অপ্রিয় ঘটনাগুলোও উল্লেখ করা উচিত। যারা কেবল মুক্তিযুদ্ধের ফল উপভোগ করার প্রতীক্ষায় ছিল এবং এই যুদ্ধে অংশ না নিয়ে আজ যারা মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার হয়ে বসেছে তাদের উন্মোচন করা উচিত।

আজ সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের মুখে শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়ে তুলতে হলে '৭১-এর ন্যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ত্যাগ স্বীকার করে, প্রত্যেককে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অবদান রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই কাজটি মুক্তিযুদ্ধের দাবিদারদের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সত্য ও অসত্য উভয়ই জনসাধারণের জানা একান্ত প্রয়োজন।

সিলেট অঞ্চলে আমার কোনো কাজ না থাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রায়শ কোনো না কোনো জায়গায় যেতাম। সিলেটে একাধিক চা বাগান রয়েছে। চা বাগানের সমস্ত বাঙালি অফিসার মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করায় কাজকর্ম বন্ধ ছিল এবং তারা তাদের বিভিন্ন যানবাহন মুক্তিবাহিনীর কাছে সোপর্দ করার জন্য ভারতীয় সীমান্তে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতেই কোনো এক সময় চিত্ত দত্তের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল চিত্তরঞ্জন দত্ত) সাথে দেখা হয়। তিনি কিছু অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যের সাহায্যে চা বাগানের বিভিন্ন প্রবেশপথ defend করার বন্দোবস্ত করেন। আমি তাকে ১৯৪৯ সাল থেকেই চিনতাম। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু আলোচনা হয়। চিত্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলছিল যে অনিয়মিত বাহিনীর মধ্যে কোনোরকম শৃঙ্খলা ছিল না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য নিয়মিত বাহিনীর কোনো অফিসার তার দলে দেওয়া হয় নি। তিনি আরো দুঃখ করেন যে ওসমানী হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে কোনো প্রকার সংবাদ দেওয়া হয় নি। তিনি শুনলেন যে আমি স্বেচ্ছায় মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার চেষ্টা করছি।

এখানে মানিক মিয়া নামক জনৈক এমপির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তার মতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হাজার পঞ্চাশেক অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। কোথা থেকে তিনি একটি পিস্তল পান আর এই অস্ত্রটি তার

বেল্টে ঝুলিয়ে রাখতেন। তার কাজকর্মে ও কথায় ব্রিগেডিয়ার পান্ডে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। জানি না কে বা কারা তাকে কমান্ডারের পদমর্যাদা দেয় এবং এই পদটি তিনি সর্বদাই ব্যবহার করতেন। এমনকি ১৬ ডিসেম্বরের পরেও তাকে সবাই কমান্ডার মানিক চৌধুরী বলে ডাকতেন। তবে আমার স্পষ্ট মনে আছে তার কাছ থেকে যখনই আমি অস্ত্রধারীদের সাহায্য চাইতাম তখনই কোনো না কোনো অজুহাতে অপারগতা প্রকাশ করতেন। আসলে তার বাহিনী ছিল লুটপাটের বাহিনী। চার্লি কোম্পানি ক্রমাগত পিছু হটতে বাধ্য হয়ে শ্রীমঙ্গলের দিকে আসতে থাকে। আমি নিজেও মৌলভীবাজারের সার্কিট হাউস থেকে সরে গিয়ে চা বাগানের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গেস্ট হাউসে আশ্রয় নেই।

এই গেস্ট হাউসে দুএক দিন থাকাকালীন গভীর রাত্রে একদল স্থানীয় আওয়ামী লীগের ছোটখাটো কর্মী আমাকে উঠিয়ে মৌলভীবাজারের সরকারি ব্যাংকের বিরাট সমস্যার কথা এসে জানায়। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে এই ব্যাংকটি ধ্বংস করা হয়। এই নির্দেশ কে দিয়েছিল তা আমি খোঁজ করে জানতে পারি নি। কর্মীদের কথায় জানতে পারলাম ব্যাংকের ভল্ট ধ্বংস করায় সোনাদানা টাকাপয়সা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং লুটতরাজ শুরু হয়। এটি থামাবার জন্যই কর্মীবৃন্দ আমার সাহায্য চায়। আমার কী করার ছিল বুঝতে পারলাম না। তবুও কর্মীদের আকুল আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি প্যান্ট গেঞ্জি পরে ও চাইনিজ রাইফেল নিয়ে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে দেখি বহু খাকি পোশাকধারী ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকের সম্পদ বস্তা বোঝাই করছে। আমি উপস্থিত হওয়া মাত্রই এইসব লুটেরা সরে পড়তে শুরু করে। ব্যাংকের আঙিনায় ঢুকে আমি হোঁচট খেয়ে পড়ি এবং দেখতে পাই যে কারেন্সি নোটের উপর দিয়ে আমি হাঁটছি। কিছু সোনাদানাও আমার চোখে পড়ে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর আমি কর্মীদের কারেন্সি নোট ও অলংকারসমূহ বস্তাবন্দি করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়ে যাই। পরে শুনতে পেয়েছিলাম যে এই কর্মীরা ৫–৭টি ট্রাঙ্ক বোঝাই নোট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে হস্তান্তর করে। আরো জানতে পারি যে এই সম্পদের দায়িত্ব জনাব এম আর সিদ্দিকী যিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ ছিলেন তারই উপর ন্যস্ত করা হয়।

সিলেটে থাকাকালীন কোনো এক সময় ভারতীয় লে. কর্নেল লিমিয়ার সঙ্গে দেখা হয়। সিলেটের এয়ারপোর্ট রক্ষা করার জন্য তার ব্যাটেলিয়নের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যায়ে লিমিয়া তার বাহিনীকে কাজে লাগাবার সময় পায় নি। লিমিয়া কিন্তু তার আর্মি কর্তৃক দেওয়া জিপ না চালিয়ে সদ্য নতুন ফোর হুইল ড্রাইভের একটি জিপ কবজা করে নিয়েছিলেন।

গেস্ট হাউসে থাকাকালীন এম আর সিদ্দিকীসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আমার এক বৈঠক হয়। তারা জানতে চায় শ্রীমঙ্গলকে রক্ষা করা যায় কি না এবং এটা না পারলে আর কতদিন পাকবাহিনীর অগ্রগতি ঠেকানো যায়। আমি এই শহর

পরিত্যাগ করবার জন্য তাদের পরামর্শ দেই। কারণ সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানির দক্ষতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সম্ভবত এই বৈঠকের পরপরই শ্রীমঙ্গলের উপর পাকিস্তানি বিমান আক্রমণ হয়। দু-চারটি বোমা পেট্রল পাম্প এলাকায় পড়ে। এরপর কে যেন এসে আমাকে জানান যে, শ্রীমঙ্গলের এক গুদামে প্রচুর পরিমাণে চাল ও গম সংরক্ষিত রয়েছে। এটার কী বন্দোবস্ত হবে। আমি তাদের গুদাম খুলে দেয়ার নির্দেশ দেই। একটু পরেই দেখা গেল যে চা বাগান থেকে অজস্র কুলি বস্তা বোঝাই শস্য মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গুদাম উজাড় হয়ে গেল। খুশি হলাম যে এই দ্রব্যাদি শত্রুর হাতে পড়ে নি।

চা বাগানের কুলি সম্প্রদায় ও তাদের সর্দার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিরুৎসাহিত ছিল। তারা বিরোধিতা করবে আবার অন্যদিকে আবেগ বশীভূত হয়ে অংশগ্রহণও করবে। চা বাগানের জীবনটাই আলাদা। কুলি সম্প্রদায় বাঙালি নয়। ব্রিটিশ চা বাগানের মালিকরা বলপূর্বক এসব সম্প্রদায়কে এখানে এনেছিল। বাগানের মালিকরা এককালে প্রায় সবাই ছিল ব্রিটিশ। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থেই এই সম্প্রদায়কে তাদের মত অনুযায়ী প্রতিপালন করত। তাদের অবস্থা যে খুব ভালো তা নয়। বেশির ভাগকে দেখেছি জীর্ণ ও মলিন বসনে। দেশীয় মালিকরাই এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেয় ব্রিটিশদের অনুকরণে। চা বাগানের বাঙালি কর্মচারীরাই আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

সিলেটে থাকাকালীন কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তিত্বের সাথে আমার পরিচয় হয়। তাদের কথাও আমার লেখায় থাকা উচিত বলে মনে করি। এখানে ছিলেন ফরিদ গাজী নামক এক নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তিনি যুববেলা থেকেই আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন। ইনি হলেন সেই গাজী যে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গাড়িতে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গাজীর উৎসাহ ও প্রেরণা আমাদের থেকে কম ছিল না। অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ তার ছিল না। তবে এ কাজ ব্যতীত সব সময় যেকোনো দায়িত্ব সহাস্যে পালন করতেন। সুরমা নদীর উত্তর পাড়ে তখন ছিল বন্যার সময়। এই প্রতিকূল অবস্থাতে তিনি বুকভরা পানির মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর চিঠিপত্র বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতেন। এখানে দেখা হয় জাকির খান চৌধুরী নামক এক যুবকের সাথে। এর কথা আমি ইতিহাসে 'সত্য ও অসত্য অবস্থান' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। তার সাহসিকতায় ও দেশপ্রেমে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। চার্লি কোম্পানির সাথে সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় জাকির খান খাওয়াদাওয়া থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি যুবকের সাথে আমার পরিচয় হয়। ইনি হচ্ছেন মুনতাকিম চৌধুরী এমএনএ-এর ভাগনে ইসমত চৌধুরী এবং চা বাগান মালিকের সন্তান। এ পরিচয় আমার আগে জানা ছিল না। তাকে চিনেছিলাম এমন এক ব্যক্তি হিসেবে যার সিলেটে প্রতিটি চা বাগানের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত পরিচয় ছিল। একবার সেনা সদস্যদের পশ্চাৎপদ করার সিদ্ধান্ত ব্রিগেডিয়ার পান্ডে নিয়েছিলেন। তবে

এই রাস্তায় একটি পুল ভাঙা ছিল। এটিকে মোটরযান অতিক্রম করার দায়িত্ব তিনি নেন। পুল বা ব্রিজ মেরামত সংক্রান্ত তিনি যেভাবে কথাবার্তা বলছিলেন মনে হয়েছিল যে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অনেক দিন আমি তাকে এভাবেই চিনতাম। চার্লি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করার সময় আক্কাস নামক এক যুবককে কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে দেখতে পাই। আমি ভেবেছিলাম তিনি এই কোম্পানিরই একজন অফিসার। পরে জানতে পারি তিনি বালাগঞ্জের অধিবাসী। যখন প্রথম দেখা হয় তিনি এই হেডকোয়ার্টারের, 'রেকি' করে ফিরে এসে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শুনেছিলাম তাকে এই কোম্পানি পিছু হটাকালীন বেশ কয়েকবার রেকি করার দায়িত্ব দিয়েছিল। ভদ্রলোকের কথায় ও কাজে মনে হল তিনি খুব সাহসী ও দেশপ্রেমিক। তিনি এই কোম্পানির সাথে বেশ কিছু সময় কাটান। পরবর্তীকালে তার সাথে আমার পরিচয় আরো গভীর হয়েছিল।

জকিগঞ্জকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু সৈন্য এখানে অবস্থান নেয়। এদের সাহায্যের নিমিত্ত ভারতীয় বিএসএফ সদস্যদেরও ব্যবহার করা হয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই রাস্তা খোলার লক্ষ্যে একদিন এগিয়ে আসার সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই বিএসএফ–এর সদস্যরা অতি দ্রুত রুদ্ধশ্বাসে বুট ও আন্ডারওয়্যার পরেই পলায়ন করতে শুরু করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরাও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পিছু হটে আসে এবং গোলাপগঞ্জ পাক সেনাদের হাতে আসে। বিএসএফ–এর পলায়ন আমি অন্যের মুখে শুনেছিলাম, প্রত্যক্ষদর্শী নই। তবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে আমি বিএসএফ–এর কাপুরুষতার প্রত্যক্ষদর্শী।

চার্লি কোম্পানি পিছু হটে এসে ভারতের আশ্রম বাড়িতে ক্যাম্প করে। এই পর্যায়ে আমি আগরতলায় বাংলাদেশের স্থাপিত হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। এখানে এসে ওসমানীর সন্ধান পাই নি। সম্ভবত তিনি কোলকাতাতে মুক্তিবাহিনী হেডকোয়ার্টারে ব্যস্ত ছিলেন। তবে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি আগরতলায় পরিদর্শনে আসেন। সম্ভবত কয়েকটি কমান্ডারদের মিটিংও ডেকেছিলেন। এগুলোর কথা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে যে প্রায় প্রত্যেক মিটিং–এ তিনি ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে পদত্যাগের হুমকি দিতেন।

আগরতলা বসে থাকাকালীন কর্নেল রব যিনি পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন তার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হত। তিনি ছিলেন সাপ্লাই কোরের অফিসার। ইচ্ছাপূর্বক তিনি মিলিটারি অপারেশনের কোনো দায়িত্ব নেন নি। ভদ্রলোককে চিনতাম ১৯৪৯ সাল থেকে। আইয়ুব খানের স্টাফ ক্যাপ্টেন ছিলেন। রব ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র ও সংস্কৃতিবান। তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, ওসমানী সাহেবের কি কোনো ইচ্ছা আছে আমার দীর্ঘদিনের সামরিক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করার? তার ভাষা ছিল সিলেটি ডায়লেক্টের সাথে মিশানো। তিনি নির্বাচিত এমএনএ ছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সব হবে, সব হবে, শীঘ্রই হবে। এসময় এক অচেনা ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করে মাহবুব আলম চাষী বলে পরিচয় দিয়ে। ফরেন সার্ভিস থেকে বহুদিন আগে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

আমার পরিচয় নেবার পর জানান যে তার সাথে ডিপি ধর ও ত্রিগুণা সেনের আলোচনা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়ার পদক্ষেপও নিচ্ছেন। এ মুহূর্তে একটি রিক্রুটিং পলিসি তৈরি করা উচিত। ধর্মশালায় এই সংক্রান্ত একটি মিটিং হবে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম। রিক্রুটিং পলিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পলিসি। এটি ওসমানী সাহেবের সাথেই আলোচনা করা দরকার। তবুও তিনি আমাকে মিটিং-এ যোগদান করার আহ্বান জানান। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গিয়েছিলাম। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিনের মধ্যেই চাষী আলমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি বলেন যে, এই মিটিং অন্যত্র হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সমঝোতা হয়েছে। আমাকে জানাতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে সহাস্যে মিটিং-এর সিদ্ধান্ত জানান।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারীদের রিক্রুট করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপর। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম এটা তো সঠিক নয়। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদের ওপরে এ দায়িত্ব দেয়া উচিত ছিল। এর উত্তরে তিনি গর্বের সাথে বললেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব নিয়েছেন যেন কোনো বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছেলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য রিক্রুট করা না হয়। আমার কাছে তখন এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মনে হল। আমি এই মত পোষণ করতাম যে, দেশপ্রেমিক যুবক মাত্র সকলেরই এই যুদ্ধে অংশ নেবার অধিকার রয়েছে।

১৯৪৩ সাল থেকে নৌবাহিনীতে থাকাকালীন আমি দেখেছিলাম যে ব্রিটেনের সকল শ্রেণী ও সকল মতাবলম্বীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেয়া হয়েছিল। দেশপ্রেম বজায় রাখার অধিকার কোনো এক বিশেষ পার্টির ওপর ন্যস্ত হয়। ভুল রিক্রুটিং নেবার কারণে মুক্তিবাহিনীর যে ক্ষতি হয়েছিল তা সমাজে আজ লক্ষণীয়।

আগরতলা থাকাকালীন একদা আমার সাথে শফি ও জিয়ার সঙ্গে দেখা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, যুদ্ধ বেগবান করার জন্যই কথা হচ্ছিল। পূর্বাঞ্চলের কমান্ডাররা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কমান্ডারদের নিজেদের সুবিধা অসুবিধা ও চাহিদা সেনাপ্রধানের কাছে পৌছাতে পারছিল না। এটা ছিল নেহায়েতই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা থেকে আমরা একমতে পৌছাই যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত হবে। ইস্টার্ন হেডকোয়ার্টার ও ওয়েস্টার্ন হেডকোয়ার্টার নামক দুটি সংস্থা গঠন করা দরকার। শফি ও জিয়ার ওসমানীর উপর বিশেষ আস্থা ছিল না। তারা প্রস্তাব করেন যে, ওসমানী সাহেবকে ডিফেন্স মিনিস্টারের পদোন্নতি দিয়ে ইস্ট এবং ওয়েস্ট নামক দুটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হোক। এই প্রস্তাবটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে যাবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেয়। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি একসময় কলকাতা পৌছাই। সেসময় হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশের একাধিক অফিসার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রস্তাবটি তারাও অনুমোদন করেন।

কলকাতায় এসে আমি এক কুচক্রের মধ্যে পড়ে যাই। বাংলাদেশ হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত অফিসাররা আমাকে দুটি প্রশ্ন করে। প্রথমটি ছিল আমি কেন মেজর শফির অধীনে তার ব্যাটেলিয়নে চার্লি কোম্পানির দায়িত্ব নিই। দ্বিতীয়টি ছিল গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ আর খন্দকার আমার অনেক জুনিয়র হওয়া সত্ত্বে কেন তাকে D.C.O.S করা হয়েছে।

প্রথমটির উত্তরে আমি বলেছিলাম যে সিনিয়রিটি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করা অনুচিত হবে। শফির ব্যাটেলিয়নে আমি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবেও যুদ্ধ করতে রাজি ছিলাম যদিও তিনি আমাকে ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। চেইন অব কমান্ড সহসা ভাঙা উচিত নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম যে খন্দকার একজন বিমান বাহিনীর অফিসার। স্থলযুদ্ধে হঠাৎ করে কমান্ড দেয়া অনুচিত হবে। খন্দকারকে আমি ভালোভাবে চিনতাম। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বিমান বাহিনী অফিসার এবং অত্যন্ত ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। আমার সঙ্গে ওসমানীর পেশাগতভাবে ভালো সম্পর্ক ছিল না। খন্দকারই তাকে সামাল দিতে পারবে এবং আমাকে যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্ত কোনো এক সেক্টরে পাঠানোই শ্রেয় হবে। এ বিষয় নিয়ে আর কোনোদিন কোনো কথাবার্তা হয় নি। যে অফিসার যেখানে বেশি অবদান রাখতে পারবে তাকে সেখানে নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ। আর এখানে পদোন্নতির কথা চিন্তা করা অন্যায় হবে। তাই একদিন হেডকোয়ার্টার ময়দানে ওসমানী সাহেবের সাথে সামনাসামনি হলে তিনি আমাকে কর্নেল জামান বলে অভিহিত করায় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এবং তার ভুল সংশোধন করতে গিয়ে বলেছিলাম আমি তো মেজর জামান, কর্নেল জামান নই। এর উত্তরে তিনি সহাস্যে বলেছিলেন সেক্টর কমান্ডারদের লে. কর্নেলে পদোন্নতি করা হয়েছে। আমি বিস্মিত হই। জনযুদ্ধে প্রমোশনের চিন্তা আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। একজন মেজর হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন।

দুটি হেডকোয়ার্টার স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আমি কলকাতায় যাই। আমি ঠিক করেছিলাম এটি সর্বপ্রথম ওসমানী সাহেবের সাথে আলোচনা করব। কিন্তু দু দিন হেডকোয়ার্টারে থেকেও ওসমানী সাহেবের সাথে দেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। ওসমানী সাহেব সদাই ব্যস্ত থাকতেন। তার এই ব্যস্ততা আমাকে ঠেলে দেয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দিকে। তাজউদ্দিন সাহেবের অফিসে গিয়ে আমার উপস্থিতি ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সুযোগ মেলে।

তাজউদ্দিন সাহেব আমার সাথে সহাস্যে মিলিত হন। পরস্পরের সাথে সামান্য পরিচয় ছিল। একসময় আমি ও তিনি মাত্র দুজনই মেজর জলিলের নয় নম্বর সেক্টর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। সামান্য দু-চারটি কথাবার্তার পরই আমি আমার প্রস্তাবটি বিস্তারিতভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করি। মুক্তিযুদ্ধ বেগবান করাই আমাদের সকলের লক্ষ্য। এটির ওপরই আমি জোর দিয়েছিলাম। হঠাৎ একসময় তিনি জিজ্ঞাসা করে বসেন যে, মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে পদোন্নতি প্রবণতা দেখা দিয়েছে কি না। আমি তাকে জানাই যে পদোন্নতির সাথে

আমাদের প্রস্তাব আদৌ জড়িত নয়। তার কোনো এক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাকে আমি জানাই যে মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরপরই আমি মুক্তিবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে সিভিল লাইফে ফিরে যাব এবং এই পদত্যাগপত্র আমি এখনই তার দপ্তরে জমা দিয়ে যাব। কেবল তারিখটা বসিয়ে নিলেই হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছিলাম। ড. ফারুক আজিজ খান যিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সচিব ছিলেন এই ঘটনার সাক্ষী।

তাজউদ্দিন সাহেব আমার প্রস্তাবটি নিয়ে তাঁর সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করার আশ্বাস দেন। তিনিও তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। তবে শুনতে পেয়েছিলাম যে, ওসমানী প্রস্তাবটি সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। এই বিষয় নিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী ও সেক্টর কমান্ডারদের আলোচনা হয় তখন সে মিটিঙে ওসমানী সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। আরো শুনতে পাওয়া যায় যে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক দৃষ্টিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও ওসমানী সাহেব নিজেই এটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। প্রস্তাবটি নাকচ করার কারণ ওসমানী সাহেব আমার ও খোন্দকার সাহেবের কাছে আলোচনা করতে পারতেন।

আমি কিছু দিন কলকাতায় ছিলাম। এসময় ওসমানী সাহেব আমাকে এবং উইং কমান্ডার মির্জাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অফিসার 'সিলেক্ট' করবার দায়িত্ব দেন। আমরা দুজন কলকাতা থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টরে গিয়েছিলাম। আবেদনকারী যুবকদের সংখ্যা মোটামুটি ভালোই ছিল এবং উপযুক্ত সংখ্যা কম ছিল না। বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক ল্যান্স নায়েক, নায়েক আবেদন করেছিল। পারতপক্ষে আমি এদের সিলেক্ট করতাম না তাদের চারিত্রিক কারণে। গাঁজা সেবনের অভ্যাস আছে কি না প্রায় সকলকে জিজ্ঞাসা করতাম। যারা লজ্জা জড়িত হাস্যে সেবন দোষের কথা স্বীকার করত তাদেরকে আমি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতাম। পরবর্তীকালে এরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর যোগ্যতা ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছিল।

এই ট্যুর প্রোগ্রামকালে দিনাজপুর শহরের সন্নিকটে মেজর নাজমুল হুদার সাব-সেক্টরে যাই। তার কার্যকলাপ দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তোপখানার একজন অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অপারেশনের দায়িত্ব সুশৃঙ্খলভাবেই পরিচালনা করছিলেন। নাজমুল হুদা ছিলেন ধীর ও শান্ত প্রকৃতির এবং স্বল্পভাষী। তাঁর অনাড়ম্বরে আমরা বেশ মুগ্ধ হই।

এই দায়িত্ব পালনের পর আমি আগরতলায় ফিরে যাই। আগরতলা থাকাকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে আমার দু-এক ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। যে সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরায় শরণার্থী আসছিল তাতে তারা বিস্মিত হন এবং শাসন ব্যবস্থায় যে কিছু অনাসৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন সেটা হয় নি। তাদের মুখে শুনলাম যে আগরতলার জনসংখ্যা শরণার্থীদের কারণে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদির ঘাটতি দেখা দেয় নি। এমনকি জিনিসপত্রের দামও বাড়ে নি। সমস্ত সাপ্লাই নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসছিল। সেখানে এসে শুনতে পাই যে

আমার পনের বছরের সন্তান যাকে কিনা আমি করাচিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সে স্বেচ্ছায় ফিরে এসে খালেদ মোশাররফের বাহিনীতে যোগ দেয়। এখানে সে জাহানারা ইমামের পুত্র রুমি ও তাদের সঙ্গীদের সাথে ছিল। পরে আমি যখন সাত নম্বর সেক্টর কমান্ডার হই তাকে আমার সেক্টরে নিয়ে আসি।

আশ্রমবাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখি চার্লি কোম্পানি ভারত সীমান্ত থেকে আরো পিছু হটে নতুন ক্যাম্প করেছে। আমার বিছানাপত্র ও বাক্সটি সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। বাক্স খুলে দেখি আমার বায়নোকুলারটি গায়েব হয়ে গেছে। মৌলভীবাজারে ব্যাংক ভল্টের প্রচুর পরিমাণ টাকা অনেকেই পকেটস্থ করেছিল। সেখানে একটি বায়নোকুলার পাওয়া যায় যেটি আওয়ামী লীগের এক কর্মী আমাকে উপহার দেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান হয়তো ভেবেছিলেন যে আমার বাক্সে প্রচুর পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে।

এ যাবৎ কাল আমি, আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা যাদের করটিয়াতে রেখে এসেছিলাম, তাদের কোনো সংবাদ পাই নি। শুনতে পেয়েছিলাম খালেদ মোশাররফের মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ঢাকা থেকে কয়েকটি পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং জিয়াউদ্দিন নামক এক যুবকের সন্ধান পাই। ছেলেটির পরিবারকে আমি ৩০ দশক থেকে চিনতাম এবং তাকে দেখেও খুব স্মার্ট লাগল। আমার পরিবার উদ্ধারের প্রস্তাবে সে রাজি হয়। ঢাকায় গিয়ে সে আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু এই যোগাযোগ নাকি কিছুটা জানাজানি হয়ে যায়। সে কারণে আমার স্ত্রী এবং কন্যাদ্বয় তার সাথে ফিরে না এসে সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে খালেদ মোশাররফের সেক্টরে অনেক বাধাবিঘ্ন ও বিপদ এড়িয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আমি তাদের কলকাতায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেই। ত্রিপুরার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আমাকে এ সংক্রান্ত সাহায্য করেন।

ওসমানী আমাকে আসামের তুরায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় আগরতলায় বসে না থেকে আমি কলকাতায় চলে যাই। কলকাতায় পৌঁছাবার পর ওসমানী সাহেব আমাকে সাত নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নিতে বলেন। আমি তাকে জানালাম যে, সেখানে মেজর নাজমুল হুদা বেশ ভালো কাজ করছে। ছয় নম্বর সেক্টরে আবু ওসমান চৌধুরী ছিলেন। তিনি ছিলেন সাপ্লাই কোরের একজন অফিসার। আর নাজমুল হুদা ছিলেন তোপখানার অফিসার। ছয় নম্বর সেক্টরে যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি গড়িমসি করতে থাকেন এবং সাত নম্বর সেক্টরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সম্ভবত তিনি আমাকে তার অতি নিকটবর্তী কোনো সেক্টরে রাখতে চাইছিলেন না। যাক, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

সাত নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নেবার জন্য আমি ভারতীয় দিনাজপুর টাউনের নিকটস্থ তরঙ্গপুর নামে একটি নির্জন আমবাগানে উপস্থিত হই। আমার আসার এবং সেক্টরের দায়িত্ব নেবার কথা তোপখানার মেজর নাজমুল হুদা আগে থেকেই জানতেন। পৌঁছামাত্রই তিনি জানালেন যে প্রেম সিং নামক এক ব্রিগেডিয়ার যিনি এই সেক্টরকে

সাহায্য করার দায়িত্বে ছিলেন এবং আসামাত্র যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করি, এই মর্মে একটি 'মেসেজ' ছিল। পরিস্থিতিটা আমার কাছে বিব্রতকর লাগছিল।

প্রেম সিঙের 'মেসেজ' অনুযায়ী আমার সংরক্ষিত টেন্টে ছোট্ট একটি বাক্স রেখে চলে যাই। ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিঙের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক ধরে অনেক আলোচনা হয়। প্রেম সিং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় কমিশন পান। তিনি পেনশনের অপেক্ষায় ছিলেন। আমি দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির ২য় কোর্স থেকে পাস করা জেনে তিনি খুবই খুশি হলেন এবং এই কোর্সের বেশ কয়েকটি অফিসার যারা ব্রিগেডিয়ার পদে আছেন তাদের নাম বললেন। আমিও অনেককে স্মরণ করতে পারলাম।

প্রেম সিঙের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে কোনো সৈন্য ছিল না। কেবল ছিল কিছুমাত্র স্টাফ অফিসার ও প্রয়োজনীয় লোকবল। মেজর ব্যানার্জী নামক এক বাঙালি অফিসার ছিলেন ব্রিগেড মেজর এবং মেজর কলি নামে একজন DQ। বাকি কারো নাম মনে পড়ে না। তার হেডকোয়ার্টার ছিল তাঁবুতে। এই হেডকোয়ার্টারের দায়িত্ব ছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারকে সার্বিকভাবে সাহায্য করা। যেমন : অস্ত্র সম্ভার, গোলাবারুদ, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব। তিনি নাজমুল হুদা সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলা সত্ত্বেও বললেন যে তার পক্ষে সব সাব-সেক্টরের অপারেশনের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বিশেষ করে আমাকে অপারেশনের দায়িত্বটাই গ্রহণ করার উপদেশ দিলেন।

সত্যি কথা বলতে জুন-জুলাই মাসের দিকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কমে যায়। এর কারণ আছে। ২৫ মার্চের রাত্রে আকস্মিকভাবে অসহায় জনগণের ওপরে এবং ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বাঙালি সৈন্যদের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছিল। ঠিক এমনই ভাবে পিলখানায় অবস্থানরত ইপিআর-এর বাঙালি সৈন্যদের ওপর এবং রাজারবাগে পুলিশ নিবাসে আঘাত হানা হয়। এসব আঘাত হানাকালে যেসব ইউনিট বা দলের ওপর বাঙালি অফিসারদের কর্তৃত্ব ছিল তারা এই আঘাত অনুমান করতে পেরে পিছু হটে গিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। সারা বাংলাদেশে এই দলবদ্ধ ইউনিটের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সকলে মনে করছিল তারা বুঝি একাই আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছে। কোনো প্রকার কেন্দ্রীয় কমান্ড না থাকার দরুন এইসব ইউনিটগুলোকে পরিকল্পিতভাবে retreat করার ব্যবস্থা নেয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পিছু হটে যাওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আঘাত হানার কোনো তথ্যাদি কোনো ইউনিট বা পিছু হটে যাওয়া পুলিশ বা ইপিআর বাহিনীর ছোট ছোট কমান্ডারের নিকট ছিল না। তারা ভারত সীমান্তের দিকেই পিছু হটে যাওয়া সঠিক ও নিরাপদ মনে করে, যাতে তাদের পিছন দিকে থেকে কোনো আঘাত না আসে।

ভারতের সাথে পাকিস্তানের সখ্য ছিল না এটা সবাই জানত। তবুও আক্রমণকারী পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রধারী গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ভারত সীমান্তে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিল এই আশায় যে পাকিস্তান বাহিনী ভারত

সীমান্ত অতিক্রম করবে না। সম্ভবত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই গোষ্ঠীদের সীমান্তে অবস্থান নিতে দেবে। এই সমস্ত বাহিনী ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে একত্রিত করতে বেশ সময় লাগে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, পিছু হটে আসা বাঙালি বাহিনী কোনো ভারী অস্ত্রাদি বা সরঞ্জাম নিয়ে আসতে পারে নি এবং তা সম্ভবও ছিল না।

অন্যদিকে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত হয়। এদের সবাই ছিল খালি হাতে এবং সামরিক প্রশিক্ষণবঞ্চিত। কয়েক মাস না যাওয়া পর্যন্ত যুব সম্প্রদায়কে রণাঙ্গনে পাঠাবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। আবার এটাও দেখতে হবে যে ভারত সীমান্তে পৌছামাত্রই ভারত কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে এই যুব সম্প্রদায়কে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারার সম্ভাবনা ছিল না। ভারতীয় রাষ্ট্র যে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সামরিক সাহায্য দেবে এই চিন্তা তো সঠিক নয়। তা ছাড়া ভারতীয় বাহিনীর কাছে তাদের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত অস্ত্রাদি সংরক্ষিত থাকবে এই ধারণাও করা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সমর্থন করবে এবং তাদের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে সীমান্তের চতুর্দিকে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে অস্ত্রাদি হস্তান্তর করবে এটা তো হয় না। সুতরাং এপ্রিল–জুন পর্যন্ত গেরিলা বাহিনী গঠনের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করা ছিল সময়সাপেক্ষ।

আর এই সময় বাংলাদেশ বাহিনী প্রত্যেকটি সেক্টরে আমাদের যুবকদের কেবলমাত্র ছুরি ও গ্রেনেড নিয়ে গেরিলা তৎপরতা বজায় রাখার আশাটিও করা যায় না। এতৎসত্ত্বেও যুবকেরা ছুরি ও গ্রেনেডকে সম্বল করে গেরিলা তৎপরতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলাম। এসব অপারেশনে কিছু সফলতা আসলেও বেশ কিছু অঘটন ঘটে। এসব কারণেই জুন–জুলাই মাসে বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা এবং সীমান্ত থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। অভাব ছিল অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের।

ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিং ছিলেন কাশ্মিরের অধিবাসী এবং সরলমনা। তার সাথে আমার সম্পর্কটা ভালোই গড়ে ওঠে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য বিশেষভাবে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারকে চাপ দিচ্ছিলেন এবং এই বিষয় নিয়ে বোধহয় দু পক্ষের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল। ভারতীয় সেনাপ্রধান নাকি ওসমানীর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন।

প্রেম সিং আমাকে বলতেন যে, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হবে এবং পরাশক্তিদের নতুন মেরুকরণ হবে। ভবিষ্যতে ভারত আন্তর্জাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সূত্র ধরেই ভারতের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নতুনভাবে সুসজ্জিত করা এবং যথেষ্ট পরিমাণ সরঞ্জামাদি মজুদ রাখার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় পুরাতন অস্ত্রগুলো মুক্তিবাহিনীকে দেওয়া হবে। সুতরাং তিনি আমাকে এই বিষয়টি মনে রেখেই অযথা নিত্যনতুন অস্ত্রাদির জন্য পীড়াপীড়ি না করেন। এ ছাড়াও বললেন যে, অস্ত্রাদি ব্যবহারের জন্য অভিজ্ঞতাও লাগে, যা আমাদেরকে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হবে। রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের আচারবিধি

নিয়েও অনেক কথা হল। এ সংক্রান্তে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যারা লিখেছেন, তারা অনেক আলোচনা করেছেন। তাই আমি এ সম্বন্ধে আর কিছু লেখার প্রয়োজনবোধ করছি না।

সাত নম্বর সেক্টরের অধীনে চারটি জেলাকে রাখা হয়েছিল—রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা। স্ট্রাটেজিক কারণের জন্যই রংপুরের একটি ইউনিয়নকে এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সেক্টরের যে কয়েকটি সাব-সেক্টর ছিল সেগুলো হচ্ছে—ক্যাপ্টেন রশীদের অধীনে জলঙ্গী, এটি কখনো চারঘাটা নামেও অভিহিত করা হত। মেজর গিয়াসউদ্দিনের অধীনে লালগোলা, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের অধীনে মোহেদীপুর, লে. রফিকুল ইসলামের অধীনে ভোলাহাট, লে. ইদ্রিসের অধীনে হামজাপুর, সাব-সেক্টর তপন এবং সোবরা, আঙিনাবাদ, কামারপাড়া এবং ঠাকুরাবাড়ি।

আমার সাথে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল নেহায়েতই কম। এরা ছিলেন মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন রশীদ ও লে. ইদ্রিস। গিয়াস ছিলেন পাকিস্তানকালীন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের। জাহাঙ্গীর ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার 'কোরে'। রশীদ পদাতিক বাহিনীতে রেগুলার অফিসার ছিলেন। আর ইদ্রিস EME Corps কোরের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। কিছুদিনের জন্য ফ্লাইট লে. ডব্লিউ এ রহিম তরঙ্গপুরে আসেন। বিমান বাহিনীর অফিসার হওয়ার কারণে তাকে হেডকোয়ার্টার তরঙ্গপুরে রাখা হয়েছিল। তিনি একদিন হঠাৎ আবির্ভাব হন এবং তেমনই একদিন আমার অনুমতি ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় প্রস্থান করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বাহিনীতে কমিশন পান লে. কাইয়ুম, বজলুর রশীদ, রফিকুল ইসলাম, আওয়াল, কায়সার হক ও সাইফুল ইসলাম আমার সেক্টরে যোগদান করেন। নিয়মিত বাহিনী আমার সেক্টরে না থাকার কারণও ছিল। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তিনটি ব্রিগেড সংগঠিত করার জন্য বন্দোবস্ত করছিল। অফিসারের সংখ্যা কম থাকার কারণে অনিয়মিত বাহিনীর সব সেক্টর থেকে বাছাই করা পাকিস্তান আমলের অফিসারদের এই তিনটি ব্রিগেডে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। অফিসারদের ন্যায় ইবিআর রেজিমেন্টের সকল জেসিওদের এই তিন বিগ্রেডে পোস্টিং করা হয়, কিছু সংখ্যক বাদ দিয়ে—সম্ভবত তাদের অতীতের অদক্ষতার কারণে। আমার সেক্টরের বেশিরভাগ জেসিও ছিল তৎকালীন ইপিআর বাহিনীর সদস্য। তাদের বিষয়ে আমি আমার মতামত পরে প্রকাশ করব।

রাজশাহী চারঘাটা বা জলঙ্গী সাব-সেক্টর থেকে দিনাজপুরের ঠাকুরাবাড়ির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই শত মাইল। লালগোলা এবং চারঘাটা সাব-সেক্টর ছিল গঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে। আর তখন ফারাক্কা ব্রিজ সম্পন্ন হয় নি। এ কারণে আমি লালগোলাতে কেবল দু বারই যেতে পেরেছিলাম, আর চারঘাটাতে কোনোদিন যাওয়াই হয় নি। গিয়াসের মাধ্যমে আমি রশীদের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। ১৬ ডিসেম্বরের পরে নাটোরে রশীদের সাথে আমার দেখা হয়।

অফিসারদের অভাবে ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী সীমিত থাকায় যে ক'টি সাব-সেক্টর সরাসরি আমার অধীনে অপারেশন চালাচ্ছিল সেগুলো হচ্ছে—মালন, হামজাপুর,

ভোলাহাট, মোহেদীপুর এবং লালগোলা। এই তথ্য ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিঙ্গের জানা ছিল। সম্ভবত সেই কারণে যে সমস্ত সাব-সেক্টর ভারতীয় অফিসারের অধীনে ছিল তারা সরাসরি ভারতীয় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকেই পরিচালিত হচ্ছিল। এসব সাব-সেক্টরে আমি দু-চার বার পরিদর্শনে গিয়েছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এসব সাব-সেক্টরে ছেলেদের নিয়ে একটি বিশেষ পরিকল্পনামাফিক কাজ করছিল। আর এই পরিকল্পনা ছিল যে, পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যদের ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে স্কাউট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। স্কাউট বলতে বয়-স্কাউট বুঝায় না, বুঝায় সশস্ত্র বাহিনীর সকল অভিযানে অগ্রযাত্রার পথে শত্রুপক্ষের সন্ধান বার করে এবং রক্ষণমূলক অপারেশন করে সমস্ত তথ্য নিজ বাহিনীর কাছে প্রেরণের দায়িত্ব পালন করা।

পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধের সময় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে এই ছেলেরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অপারেশন করেছিল এবং তাদের প্রেরিত তথ্যের ওপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতি নির্ভরশীর ছিল। এসব ছেলেরা অপারেশনে প্রায়ই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাইলখানেক আগে নিয়োজিত ছিল।

পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ নভেম্বর মাসের শেষে শুরু হতেই আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সামনে সেনা অবস্থানে গিয়ে আমাদের ছেলেদের খবরাদি সংগ্রহ করতাম। ভারতীয় অফিসাররা এসব ছেলেদের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন এবং বলতেন যে তাদের ভালো স্কাউটিং করার জন্যই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতি নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে এবং পাকিস্তান বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে ঘেরাও অভিযান সফল হচ্ছে।

মালন সাব-সেক্টর ছিল তরঙ্গপুর থেকে নিকটতম স্থান। এখানে যখন প্রথম পরিদর্শনে যাই তখন সাব-সেক্টরটি একজন জেসিওর অধীন ছিল। এদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমি সন্তুষ্ট হই। এদের গালগল্পই ছিল বেশি। ক্রমশ সকল স্তরের সদস্যদের ইন্টারভিউ নিয়ে বুঝলাম যে, এই সাব-সেক্টর থেকে অনেক বানোয়াট রিপোর্ট প্রেম সিংকে দেওয়া হয়েছিল।

ব্যাপক অনুসন্ধানের পরে জানতে পারলাম যে, জেসিও কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশই করতে পারত না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অধিবাসীরা মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি জানতে পারা মাত্রই গ্রামে হইচই পড়ে যেত এবং অনেক ক্ষেত্রে আজানও দেওয়া হত। এর কারণ ছিল যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আদেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন না করে তারা স্থানীয় লোকদের ঘরবাড়ি লুটপাটই করত। অনেক সময় বিশেষ এক ব্যক্তিকে ধরে আনার চেষ্টা করত। দিনাজপুরে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দ এদের সাথে জড়িত ছিল। তাদের এই দুঃসাহস এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে একদিন তারা আমার তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে এসে আমাকে একটি টেবিল ফ্যান ও টাইপ রাইটার উপহার দিতে চেয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাদের বন্দি করে গার্ড রুমে পাঠিয়ে দেই।

এই ঘটনার পর তাদের অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো আরো বিশদভাবে অনুসন্ধান করতে থাকি। ক্রমশ জানতে পারি যে, তারা আওয়ামী লীগের এক এমপিসহ ভারতীয় একটি ডাকাত দলের সাথে আপস করে দিনাজপুরের শালবন উজাড় করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। আমার আসা-যাওয়ার পথে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠিত 'স'মিল' তার প্রমাণ দিত।

একসময় আমি এই সাব-সেক্টরে একটি বিশেষ দল গঠন করে ভারতীয় ডাকাতকে বন্দি করে নিয়ে আসি। প্রেম সিঙের সাথে এ সংক্রান্ত আলোচনা করার পর এই ডাকাত সর্দারকে তরঙ্গপুরের নিকটস্থ পুলিশ থানায় আমার রিপোর্টসহ প্রেরণ করি। এই ঘটনার পর এবং সাব-সেক্টরের সদস্যবৃন্দকে একত্র করে মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণবিধি সম্বন্ধে উপদেশ দেয়ার পর, এই সদস্যদের কর্তব্য পালনে আর দায়িত্বহীনতার ঘটনা ঘটে নি। যে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছিল তা হল, মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধু ও দরদি হিসেবে সম্পর্ক স্থাপনের পর, তাদের সহযোগিতায় পাকিস্তানের ক্ষতি সাধন করা এবং পথঘাট, টেলিফোন, রেললাইন ইত্যাদি বিনষ্ট করা।

প্রত্যেক সেক্টরেই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এমএনএ, এমপিএ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দের সহায়তায় প্রশাসনিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে উপরোক্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করে সাহায্য চাই। এতে সুফলও পেয়েছিলাম, তবুও এই সংক্রান্ত একটি চিঠি আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রেরণ করেছিলাম। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি আদেশে কয়েকটি কোর্ট অব ইনকোয়ারি করতে হয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আমার হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন এবং তাঁকে মালন হেডকোয়ার্টারে পোস্টিং দেওয়া হয়। মহিউদ্দিন ছিলেন একজন অসাধারণ দেশপ্রেমিক ও দক্ষ পরিচালক। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে এই সেক্টরের আমূল পরিবর্তন আসে এবং সাব-সেক্টরটি প্রেম সিং ও আমার কাছে গেরিলা অপারেশনের সক্রিয়তা প্রদর্শন করে প্রশংসিত হতে থাকে।

আমার সেক্টরের অধিকাংশ মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল গ্রাম থেকে আগত সহজ সরল অল্প বয়স্ক যুবক, টাউন এলাকার মেহনতি মানুষ এবং ছাত্র সম্প্রদায়। ছাত্র সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্কুলে অধ্যয়নরত ছিল, স্বল্প সংখ্যক কলেজের ছাত্র ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্ররাও ছিল। মেজর নামজুল হুদাকে এই সিনিয়র ছাত্রদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য আমি উপদেশ দেই। মেজর হুদা ছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর একজন রেগুলার অফিসার। তার মধ্যে 'চেইন অব কমান্ড' প্রথার যথেষ্ট প্রভাব থাকার কারণে তিনি ইপিআর ও আনসার বাহিনীর জেসিওদের সাথে স্বভাবত বেশি যোগাযোগ রাখতেন।

ভারত সীমান্ত থেকে গেরিলা অপারেশনের সময় আমি একাধিক সাব-সেক্টরে রাত্রিযাপন করে প্রত্যুষে অপারেশন শেষে ফিরে আসা ছেলেদের সঙ্গে গল্পের ছলে তাদের

কাছ থেকে বিগত রাতের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করতাম। ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে জেসিও কর্তৃক বিবরণের সাথে ছেলেদের বিবরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকত। ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে জেসিওরা একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে ছেলেদের এগিয়ে দিত। অর্থাৎ তারা নিজেরা কোনো 'রিস্ক' নিত না এবং এ কারণে ছেলেদের অপারেশনের ওপরে জেসিওদের কোনো কর্তৃত্ব থাকত না। এসব দেখেশুনে আমি মেজর নাজমুল হুদাকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের থেকেই নেতা নিযুক্ত করে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাদের দেয়ার পরামর্শ দেই।

একসময় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ইপিআর-এর এমনকি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুষ্টিমেয় সদস্যের মধ্যে যারা যত সিনিয়র তারা তত কাপুরুষ। এরা ক্যাম্পে হম্বিতম্বি করে ছেলেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারদর্শিতা দেখালেও অপারেশনে না যেতে তারা বহু অজুহাত দেখাত এবং গেলে সাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম ছিল না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, তারা সবাই যে কাপুরুষ তা নয়। ব্যতিক্রমও ছিল।

একপর্যায়ে আমি ইপিআর ও ইবিআর সদস্যদের ওপরে এমনই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলাম যে আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা পোস্টিং নিয়ে সেক্টরে আসলে তাদের বিদায় করে দিতাম।

মোহেদীপুরের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। এই সেক্টর অপারেশনে খুব সক্রিয় ছিল। যার কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কিছু পিছু হটেও যাচ্ছিল। সাব-সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। হঠাৎ একদিন আমি এই হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছালে বেশ গোলযোগ দেখতে পাই। স্থানীয়রা, যারা আমাদের সর্বদাই সাহায্য করে এসেছে, তাদের কয়েক জনের প্রতিনিধি এই হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত পরিচালকদের কাছে বিশেষ এক অভিযোগ নিয়ে আসে। অভিযোগ ছিল একজন ইপিআর জেসিওর বিরুদ্ধে। বিগত রাত্রে সে নাকি গ্রামে উপস্থিত হয়ে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে কিছু আদায় করবার চেষ্টা করেছিল। এক নারীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রমের চেষ্টাও চালিয়েছিল। এর মধ্যে হইচই পড়ে যায় এবং সেই জেসিওটিকে তারা ধরেও ফেলে।

আমি যখন উপস্থিত হই তখন বুঝতে পারি যে অভিযোগকারী প্রতিনিধিরা চাক্ষুষ সাক্ষীসহ সেজিওটির অসৎ ব্যবহার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। তবুও আমি পুনরায় তদন্ত করে জানতে পারি যে জেসিওটির অপরাধ প্রমাণিত। এই অপরাধ ছিল অমার্জনীয়। তার সঙ্গে আরো লক্ষ্য করি যে, গ্রামবাসী কতটা বিক্ষুব্ধ হয়েছে। বিষয়টি সমাধান করতে না পারলে মুক্তিবাহিনীর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। গ্রামবাসীর কাছে আমি মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই এবং অবস্থার একপর্যায়ে জেসিওটির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেই। আদেশ না দিয়ে গত্যন্তর ছিল না। তাকে এক তালগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয় এবং ১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটি কার্যকর করার সময় আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ি। এই জেসিওর কার্যক্রম ক্ষমা করলে মুক্তিবাহিনীর বিশেষ দুর্নাম হত এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতা থেকে আমরা

বঞ্চিত হতাম। আর এই দুর্নাম দ্রুত রটে যেত। এসব চিন্তা করেই মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আর কোনো উপায় ছিল না।

মৃত্যুদণ্ডের প্রক্রিয়ার কাজ গ্রাম প্রতিনিধি এবং বহু লোকের চোখের সামনেই হচ্ছিল। ফায়ারিং অর্ডার দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমি গ্রাম প্রতিনিধির কাছে বলি যে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দায়িত্ব নেওয়া থেকে দূরে সরে যেতে পারি না। আসামিকে ক্ষমা করার অধিকার আমার নাই। একমাত্র গ্রামবাসী তাকে ক্ষমা করতে পারে। তাদেরকে বিবেচনা করতে বললাম যে, মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত এখন তাদের ওপরই ন্যস্ত। তারা যদি আসামিকে ক্ষমা করে, তা হলে আমি আসামিকে ক্ষমা করতে পারি। উপস্থিত গ্রাম প্রতিনিধিরা সকলে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ছিল। তারা কয়েক মিনিটের জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন। কয়েক মিনিট পরেই তাদের মধ্য থেকে একজন প্রবীণ আমাকে জানান যে আসামিকে গ্রামবাসীরা ক্ষমা করতে পারে। তবে তাকে অন্যপ্রকার শাস্তি দিতে হবে। তাকে ক্ষমা করার পরামর্শ শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আমি নতুন আদেশ দিলাম যে, আসামি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থা থেকে তক্ষণি ক্যাম্প থেকে প্রস্থান করতে হবে। এবং সে যেন কোনোদিন আমার অধীনস্থ কোনো সাব-সেক্টরের আশপাশে না যায়। আমার আদেশ মনে হল গ্রামবাসী সমর্থন করল এবং সেই জেসিওটিকে তাৎক্ষণিক 'ড্রাম আউট' করে সাব-সেক্টর থেকে বহিষ্কার করে দিলাম।

আমার সেক্টরের ইপিআর ও ইবিআর বাহিনীর সকল জেসিওই যে কাপুরুষ ও অন্যায়কারী ছিলেন তা আদৌ বোঝাতে চাচ্ছি না। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সের তুলনায় এরা সবাই ছিলেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। যুদ্ধে বা সীমান্তে গুলিবিনিময়ের অভিজ্ঞতা অনেকের ছিল। সকলেই ছিলেন বিবাহিত এবং তাদের মধ্যে ছিল পরিবারের দুশ্চিন্তা। বুদ্ধির তাদের অভাব ছিল না। অল্প বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করতেন। স্বল্পবয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল অভিযানে নতুনত্ব, কৌতূহল, উদ্দীপনা, তেজস্বিতা ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধে এই সম্প্রদায়েরই কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি।

যুদ্ধ শেষের দিকে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই লে. সাইফুল ইসলাম ও কায়সার আমার সেক্টরের সবচেয়ে বাম ফ্রন্টে উত্তরপূর্ব দিনাজপুর এলাকায় অপারেশনে নিয়োজিত ছিলেন। হঠাৎ সাইফুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত কায়সার একলা হয়ে যাওয়ায় আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। ঠিক সেই সময়ে এক মধ্যবয়স্ক ইএমই-এর জেসিও সেক্টরে পোস্টিং নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও সবল। তার ছিল হাসিমুখ। তার নাম মনে না থাকাতে আজো কষ্ট পাই। এই সুবেদারকে অপারেশনে সাহায্য করার প্রস্তাব করায় তিনি বেশ উৎসাহিত হয়ে নির্দেশ গ্রহণ করেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার মৃত্যু সংবাদ আমার হেডকোয়ার্টারে আসে। রিপোর্টে জানতে পারলাম মুক্তিযোদ্ধা কিছু ছেলে গোলাগুলিতে ভয় পেয়ে পেছনে হটে আসছিল। সুবেদার ছড়ি হাতে নিয়ে তাদের আবার ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তার

কুঁচকিতে শত্রুপক্ষের গোলা এসে লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ছেলেরা তাকে কাঁধে করে বহুদূরে এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। হাসপাতালে তার রক্ত পড়া বন্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কুলিয়ে উঠতে না পারায় রক্তক্ষয়ের কারণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এ ঘটনা মনে পড়লে আজো আমি দুঃখে জর্জরিত হয়ে পড়ি। তিনি আর্ম সার্ভিসের লোক ছিলেন। বোধহয় সৈনিক প্রশিক্ষণ কোনোদিন তিনি পানও নি। তবু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় শত্রুর সম্মুখীন ছেলেদের বাঙ্কারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে সৈনিকেরই কাজ করছিলেন। তার দেশপ্রেম আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর রিক্রুটিং পলিসির কথা আগে উল্লেখ করেছি, যেটি ছিল ভ্রান্ত। এই দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। তারা বহু ছেলেকে মুক্তিবাহিনীতে রিক্রুট করেছে, যারা ছিল তাদের কাছের বা গ্রামের লোক বা প্রজা। দেশপ্রেমে এসব ছেলেরা কত উদ্বুদ্ধ ছিল তা তাঁরা সঠিকভাবে নির্ণয় করে। সমস্ত সাব-সেক্টরে দেখা গিয়েছিল যে, এসব অসচেতন যুবকেরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এবং ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া পাবার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সব সাব-সেক্টরে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে শত্রুপক্ষের সাথে গুলিবিনিময় শুরু হওয়া মাত্রই তারা পিছু হটতে হটতে হেডকোয়ার্টারের লঙ্গরখানায় উপস্থিত হত। শুধু তাই নয় সামনে শত্রুপক্ষের অবস্থানের তথ্য পাওয়া মাত্রই তারা অকারণে ভয়ে ভীত হয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করে তাদের বীর সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপদে ফেলে দিত।

এরকম রিপোর্ট সাব সেক্টর থেকে অহরহ পাওয়ার কারণে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম। অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সামরিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত ছিল। ফায়ার ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে তাদের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট ছিল না। এই কারণে সাব-সেক্টর থেকে অদক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এসে একটি ডেমোনেস্ট্রশনের বন্দোবস্ত করেছিলাম তরঙ্গপুর আম্রকাননে। শ'খানেক ছেলেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এবাউট টার্ন করতে বলি। এদের মধ্যে থেকে দশটি ছেলেকে বেছে নিয়ে দু-চার শ গজ পেছনে আম গাছে লুকিয়ে থাকার আদেশ দেই। তাদের প্রত্যেককে নম্বর দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে তাদের কোনো এক নম্বরকে ডাক দিলে তারা যেন 'টুকি' শব্দ করে চিৎকার করতে থাকে। সারিতে দাঁড়ানো ছেলেদের আবার এবাউট টার্ন করে বলি যে তাদের দশটি শত্রু আমবাগানে লুকিয়ে আছে, তাদের কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না, তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপরে লুকিয়ে থাকা ছেলেদের এক এক জনকে চিৎকার করে উচ্চ স্বরে টুকি বলতে নির্দেশ দেই। তারপর সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি তোমাদের শত্রুদের অবস্থানের খোঁজ পাচ্ছ? সকলেই তখন আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ ডানের বা বামের দিকে শত্রুপক্ষ লুকিয়ে আছে। তখন তাদের বুঝিয়ে বললাম যে শত্রুপক্ষ রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ার আগেই যদি গুলিবর্ষণ করা হয় তা হলে তাদের নিজেদের অবস্থানই শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া

হয়। এই এক্সারসাইজের পরে তাদের সবাইকে বুঝিয়ে বললাম যে অযথা ভয়ে ভীত হয়ে গুলি ছুড়লে নিজেদের অবস্থানকেই শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়। তারা নিজ নিজ সাব-সেক্টরে ফিরে গিয়ে তাদের সঙ্গীদের যেন এই শিক্ষা প্রদান করে সে কথাও বলে দিলাম।

গেরিলা যোদ্ধাদের দ্বারা শত্রুপক্ষকে সামনাসামনি যুদ্ধে পরাজিত করার কথা আমি কোনোদিন চিন্তাও করি নি। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পেশাজীবী সশস্ত্র পাক হানাদার বাহিনীর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চার করে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়াই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তা ছাড়া পথঘাট ভেঙে দিয়ে, কালভার্ট উড়িয়ে দিয়ে, রেলপথ বিনষ্ট করে, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং টেলিযোগাযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে শত্রুপক্ষকে পিছু হটিয়ে দেবার প্রচেষ্টাকে আমরা প্রাধান্য দেই। এসব কাজে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ছিল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তাদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করা, তাদের আস্থা অর্জন করা এবং প্রয়োজনে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের ওপরই দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ যত এগুচ্ছিল গেরিলা বাহিনীর পারদর্শিতা তেমনি বাড়ছিল। গ্রামবাসীর ওপরে পাক হানাদার বাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও অত্যাচার যতই বাড়ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা এবং আমাদের সহানুভূতি ততই বেশি পাচ্ছিলাম। যুদ্ধের শেষে ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের গেরিলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে শত্রুপক্ষ পিছু হটে শহর কেন্দ্রে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করতে থাকে এবং সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

আমার লেখা থেকে পাঠকবৃন্দ ধারণা করবেন যে, '৭১-এর গেরিলা যোদ্ধাদের আমি সমালোচনা করছি। না, তা আদৌ নয়। আমি জানি একজন রাইফেলধারী সিপাহিকে প্রশিক্ষণ দিতে কত সময় লাগে। ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তাদের হাতে কোনো অস্ত্র তুলে দেওয়া হত না। 'ডামি' রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর রাইফেল রেঞ্জে গিয়ে প্রতিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিপাহির পেছনে অভিজ্ঞ সৈনিককে প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয় ইত্যাদি। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলাদি রপ্ত করতেও সময় লাগে।

আমাদের এটাও মনে রাখা উচিত গেরিলা বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য জীবনে কোনোদিন আগ্নেয়াস্ত্র চক্ষে দেখে নি। এ ছাড়াও এই সদস্যদের অধিকাংশের বয়স মাত্র ১৫-১৯ বছর ছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এদেরকে ৪-৬ সপ্তাহ ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা ছিল বিতর্কিত কার্যক্রম। এটা না করেও উপায় ছিল না। বাংলাদেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ গেরিলাদের ট্রেনিং দেবার জন্য অত্যধিক চাপও দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ট্রেনিং যে অপর্যাপ্ত ছিল তা সব সেক্টর কমান্ডারই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণে প্রায় সব সেক্টরে নবাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আবার কিছু বিশেষ ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ট্রেনিং সম্পর্কে ভারত ও বাংলাদেশের গেরিলাদের দোষারোপ করা অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অতি দ্রুত সেনাবাহিনী গঠনের ফলে তাদেরও এরকম বিপর্যয় হয়। এই যুদ্ধ সমাপ্তির ৪–৫ বছর পরে আমি গবেষণামূলক নিবন্ধ পড়ে জানতে পেরেছিলাম যে, ৬ বছরের যুদ্ধে যে সংখ্যায় শত্রুসেনা নিহত হয়েছিল তাদের প্রতিটি সৈনিককে হত্যা করতে হাজার দশেক বুলেট ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে যে, পাখি শিকারের মতো একেকটি পাখিকে একটি টোটা দিয়ে মারবার নীতি যুদ্ধে গ্রহণ করা হয় না। শত্রুপক্ষের অগ্রগতি বন্ধ করার লক্ষ্যেও সহস্রাধিক বুলেট বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই প্রত্যেক সৈনিক ও অফিসারের জন্য একটি বড় সম্পদ। আমাদের গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা অপারেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে এবং দক্ষ ও পারদর্শী হয়ে ওঠে। এটাই বড় কথা। যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা কখনো চিন্তা করি নি যে নয় মাসের মধ্যেই পরাক্রমশালী পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করতে পারব। আমরা ৫–১০ বছরের জন্য লড়াই চালিয়ে রাখার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে যুদ্ধে বিজয়ের কারণ সম্মুখ যুদ্ধেই সফল হওয়া নয়। রাজনীতিও যুদ্ধের একটি অংশ। মনীষীরা বলেছেন, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কারণেই আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অতি দ্রুত সফল হয়।

৩

তরঙ্গপুর অবস্থানকালে আমাকে প্রায়ই মালদা আসতে হত। এখানে ছিল ব্রিটিশ আমলের একটি সার্কিট হাউস। সৌন্দর্য না হলেও দৈর্ঘ্য প্রস্থে এটি বড়ই ছিল। যুদ্ধ শুরু থেকে এখানে জনাব হান্নান নামক এক জেলা জজ সাহেব সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছায় কিছু দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটি লিয়াজোঁ গড়ে তুলেছিলেন। তার সততা ও কর্মনিষ্ঠা দেখে কে বা কারা তাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া ও ভারত থেকে আসা রিলিফ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব প্রদান করেছিল। আমি একবার এটা পরিদর্শনও করেছিলাম। দুঃখের বিষয় যে এখানে ঔষধাদি ছিল না। জজ সাহেব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের প্রয়োজন পড়লে তিনি ওষুধসামগ্রী স্থানীয় সিভিল সার্জনের মাধ্যমে যোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি আশা পূরণ করতে পারেন নি, তবে চেষ্টার অভাবে নয়।

মোহেদীপুরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের মধ্যে প্রকটভাবে খুজলি দেখা দেয়। সম্ভবত এটা ভিটামিনের অভাবে হয়েছিল। এ ছাড়াও আমাদের ডাক্তারের কাছে ব্যান্ডেজ

ও ডেটল জাতীয় ওষুধেরও বিশেষ অভাব দেখা দেয়। এসব সামগ্রী আমি কিন্তু স্থানীয় সিভিল সার্জনের কাছে অনুরোধ করেও সংগ্রহ করতে পারি নি। এ বিষয়ে কলকাতার কল্যাণী উপশহরে অবস্থিত আমার স্ত্রীকে এক বার্তা পাঠিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার স্ত্রীর সাথে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্নেল লুথরার সাথে দেখা হয়। তারই উদ্যোগে এক ট্রাক বোঝাই বিভিন্ন মেডিকেল এইডস সোজা মোহেদীপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় মন্ত্রী যে এরকমভাবে নিজ উদ্যোগে ছোট একটি সাব-সেক্টরে এত দ্রব্যাদি পাঠাবেন তা আমি কখনো চিন্তা করি নি। এসবের মধ্যে ছিল সাধারণ অপারেশনের জন্য দুটি সম্পূর্ণ কিট এবং চক্ষু অপারেশনের জন্য আরেকটি কিট। আমাদের ডাক্তার মোয়াজ্জেম এটা পেয়ে কী যে খুশি হয়েছিলেন তা বলার নয়।

বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে জানি না কেমন করে মার্সিডিস বেঞ্জে নির্মিত একটি অ্যাম্বুলেন্সও বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এটা যেন আমি মালদা ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। আমি বহু চেষ্টা করে এই অ্যাম্বুলেন্সটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারি নি। বরাদ্দকৃত অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত একটি চিঠি আমার কাছে আজো পর্যন্ত কেমন করে রয়ে গেছে।

মালদার নিকটবর্তী এই জায়গায়, কেমন করে জানি না, রাজশাহীর ভোলাহাটে একটি ছোট মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। এলাকাটি ছিল দুর্গম স্থানে। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের শেষ প্রান্তে এটি অবস্থিত ছিল। পাকবাহিনী কোনোদিন এখানে আসার চিন্তাও করে নি। পরে শুনেছিলাম যে রাজশাহীতে কিছু স্বেচ্ছাসেবক, কোন এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সামান্য সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে এখানে ঘাঁটি স্থাপন করে। ভারতীয়দের সাথে গুলিগোলা আদান-প্রদানের কথাও শুনেছিলাম। তাই হঠাৎ একদিন সেখানে পরিদর্শন করতে যাই।

তাদের দেখে ভালোই লাগল। তবে কোথায় অপারেশন করছে, কার বিরুদ্ধে এবং কী উদ্দেশ্যে তা পরিষ্কার হল না। এলাকাটিকে সার্বক্ষণিক মুক্ত রাখতে পেরে তারা গর্বিত ছিল। আমি তাদের বললাম যে বাংলাদেশের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মুক্ত এলাকা হিসেবে রাখা মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাদেরকে নির্দেশ দিলাম যে আরো অগ্রসর হয়ে বোয়ালিয়া নদীতীর পর্যন্ত অবস্থান নেওয়ার জন্য। এখানে কোনো পাকবাহিনী না থাকায় কাজটি তাদের জন্য দুরূহ ছিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে দেখা গেল তাদের ঘাঁটি ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করল না।

প্রায়ই মালদায় আসতাম। সদরটি আমার রাস্তা পড়ত অন্যত্র যাবার জন্য। যতবার দেখতে পাই ভোলাহাটের দলটি নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে স্থানীয় লোকদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করে দিনগুলি কাটাচ্ছিল। আমি উপস্থিত হলে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার কথাও বারবার উপস্থাপন করত। পরে জানতে পারি যে, ভোলাহাট থেকে অজানা চোরাগোপ্তা একটা রাস্তা দিয়ে রাজশাহীর সিল্কের গুটিপোকা ও সুতা পাচার করা হত। পাকিস্তান আমল থেকেই এই পথে চোরাচালানি হয়ে আসছিল। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবসা

জমজমাট ছিল। সামরিক ইতিহাসে এ সম্বন্ধে পড়েছি। দুদেশে যুদ্ধ চলে। কিন্তু চোরাচালানি বন্ধ হয় না। আন্তর্জাতিকভাবে ইহুদি সম্প্রদায় এ বিষয়ে খুবই পারদর্শী। ইহুদি সম্প্রদায় যুদ্ধরত দুপক্ষকেই ব্যবসায় এভাবে সাহায্য করে থাকে। রাজশাহীর সিল্ক পাচারের ব্যাপারটি আমাকে বিস্মিত করে নি। আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠি এবং এই এলাকাকে আরো সক্রিয় করে তোলার পদক্ষেপ নেই। এই ছেলেদের বোয়ালিয়া নদীপাড় পর্যন্ত গিয়ে শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দেই। আমার এই আদেশ তারা পালন করেছিল তবে তাদের তথ্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি অনুমান করেছিলাম যে কিছু সংখ্যক রাজাকার একটি স্কুলে অবস্থান করছিল। কিন্তু বোয়ালিয়ার সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সক্রিয় অপারেশনে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না।

এখানে একটি বিরল ঘটনা ঘটে। অতি প্রত্যুষে আমি ভোলাহাট ঘাঁটিতে উপস্থিত হই। ছোট্ট একটি টেবিল ও চেয়ারে বসে ছেলেদের থেকে তাদের কার্যক্রমের বিবরণ শুনছিলাম। হঠাৎ দেখি এক জীর্ণ বৃদ্ধা মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে আমার দিকে আসছে। ছেলেদের খোঁজ নিতে বললাম। বললাম—দেখ তো কী বয়ে নিয়ে আসছে? মিনিট দুয়েক পরে আমি নিজে ঐ বুড়ির নিকট চলে এসে তার সরঞ্জাম দেখে বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়ি। চিৎকার করে বললাম এই ঝুড়িটি যেন তৎক্ষণাৎ বহুদূরে নির্জন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে আসা হয়। ঝুড়িতে ছিল প্লাস্টিকের 'এন্টি-পারসোনাল' মাইন। বুড়িকে প্রশ্নাদি করে জানতে পারলাম সে নির্বংশ এবং ভিক্ষা করে খায়। একটি তালগাছের পাশে ঝুপড়িতে সে থাকে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যে পথ দিয়ে দলদলিয়া নামক একটি ছোট্ট গ্রামের পাশ দিয়ে বোয়ালিয়া যাবার চেষ্টা করত, সেখানে শত্রুপক্ষ কোনো এক রাতে, তার মনে হল, কিছু যেন পুঁতে রাখছে। সে ভেবেছিল এটা কিছু লোহা, পেরেক, কাঁটা জাতীয় কিছু হবে। তার সন্দেহ জাগে, আমাদের ছেলেদের কিছু বিপদ হতে পারে। তাই সে তার ঝুপড়ি থেকে দেখা স্থানটি দেখতে গিয়ে এ মাইনগুলি কুড়িয়ে পায়। এ কী সৌভাগ্য আমাদের এবং বৃদ্ধারও। সে নিজেও এগুলির ওপর চাপ দেয়নি। দুর্ঘটনা ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ি। এই মলিন বসনের জীর্ণ বৃদ্ধা ঝুপড়িতে থেকে কী করে বুঝল যে দেশে যুদ্ধ চলছে। কেমন করে জানল আমাদের ছেলেরাই মিত্রশক্তি এবং তাদের পথে বিঘ্ন ঘটাবার ছেলেরা শত্রুপক্ষ। তা হলে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মকথা কি এই ভিখারি বৃদ্ধার ন্যায় বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে? শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমাদের ছেলেদের প্রতি তার দরদি হওয়ার কারণ কী হতে পারে। তার অন্তরের সমবেদনা থেকে সেই বৃদ্ধা আমাদের ছেলেদের পথের কাঁটা সরাতে চেয়েছিল। আমি মনে মনে তাকে হাজার সালাম জানিয়েছিলাম। ব্রিটেনে কোনো সিভিলিয়ান যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অবদান রাখলে তাকে জর্জ ক্রস দেওয়া হয়ে থাকে। সজ্ঞানে না হলেও এ বৃদ্ধা তার মনে দেশ ও ছেলেদের প্রতি ভালবাসার জন্য স্বেচ্ছায় ও

স্বপ্রণোদিতভাবে কেন এ দায়িত্ব নিয়েছিল, আমার মতো ক্ষুদ্রমনা মানুষ তা বুঝে উঠতে পারি নি। এখন হয়তো অনেকে বুঝবেন কী কারণে আমি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 'বীরউত্তম' পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি নি। এই ঝুপড়ির বৃদ্ধার মতো আরো অনেক সিভিলিয়ানের বীরত্বের প্রত্যক্ষদর্শী আমি। স্বাধীনতা যুদ্ধে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই সৈনিক। এই কারণেই স্বাধীনতা যুদ্ধে পেশাদার সৈন্যের মতো কাউকে বীরত্বের মেডেল দেওয়া হয় না। কাকে ছেড়ে কাকে দেওয়া হবে। এ পুরস্কার অগণিত দেশবাসীর প্রাপ্য।

ভোলাহাটের ঘাঁটি কিছুতেই সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারায় আমি একজন অফিসারকে পোস্টিং করি এবং এই শত্রুমুক্ত এলাকাটিকে আরো সম্প্রসারণের চেষ্টা করি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের উত্তরে অবস্থিত এই অঞ্চলটিতে শক্ত ঘাঁটি করতে পারলে মোহেদীপুরে অবস্থিত সাব-সেক্টরটি আরো নিরাপদ থাকবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য একসময় আমি হামজাপুর থেকে ইদ্রিসসহ কিছু যোদ্ধা এবং মোহেদীপুর থেকে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরসহ একটি দল এখানে একত্রিত করি এবং আমি নিজেও উপস্থিত হই। আমরা তিন জনে মিলে অপারেশনের প্ল্যান করি। জাহাঙ্গীরকে এই অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অপারেশনের আগের দিন ইদ্রিস, জাহাঙ্গীর এবং আমি নিজে আমাদের ঘাঁটির শেষ প্রান্তে 'রেকি' করতে যাই। ভোলাহাটের ছেলেদের দেওয়া তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল। আমরা নীরবে এগুচ্ছিলাম। নিজস্ব এলাকা হলেও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কে একজন হাত তুলে ইশারা দেয় পিছনে চলে যাবার জন্য। জীর্ণ কুটিরের পেছন থেকে এই ছেলেটি আঙুলে নির্দেশ দিয়ে দেখায় যে, সাদা সলোয়ার কামিজ পরিহিত দুটি লোক একটি এলএমজি নিয়ে আমাদের দিকে তাক করে আছে। আমরা চার-পাঁচ জন দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ি এবং শত্রুর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। হঠাৎ একটি গুলির শব্দ হয় আমাদের পক্ষ থেকে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম শত্রুপক্ষের একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এবং অন্যজন তার অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আমাদের কন্ট্রোলের মাটিতে দুজন শত্রু ঢুকল কেমন করে। আমরা যে পথ ধরেছিলাম সেটার খবরই বা পেল কোথে কে? আমরা যদি সামান্য অসাবধান হতাম তা হলে হয়তো অনেকেই মারা পড়তাম।

অনেক অপারেশনে আমাদের এরকম বিপর্যয় ঘটেছে। আমার মনে প্রায় সন্দেহ জাগত যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রাজাকার পক্ষের লোকও ঢুকে পড়েছিল যারা শত্রুপক্ষকে আমাদের অপারেশনের আগাম খবর দিত। পরের দিনের অপারেশন স্থগিত রাখার জন্য আমার পরামর্শ জাহাঙ্গীর ও ইদ্রিস গ্রহণ করল না। বিকাল পাঁচটার দিকে গ্রুপ কমান্ডারদের ব্রিফিং করা শুরু করল জাহাঙ্গীর। খুবই সুন্দরভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করছিল। ব্যাখ্যা শেষে প্রশ্নোত্তর পালাও শেষ হল। হঠাৎ একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলল যে পরের দিনের অপারেশনটা বড় ধরনের হতে পারে। সম্ভবত শত্রুপক্ষও

আরো কিছু সৈন্য নিয়ে আসবে। সম্ভবত অনেক হতাহত হবে। জাহাঙ্গীরকে প্রশ্ন করল, 'স্যার আমরা মারা গেলে আমাদের নাম কি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' জাহাঙ্গীর তাকে এক ধমক দিল। বলল, "স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা থাকার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি না। আমাদের রক্ত দেশের মাটির সাথে মিশে থাকাটাই আমাদের গর্ব। তোমার সৌভাগ্য এমনই যে দেশের জন্য রক্ত দেবার সময় তোমার জন্ম হয়েছে।" আর এই ছেলেটি পরের দিন শত্রুপক্ষের দিকে বীরত্বের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে বাঙ্কারে অবস্থিত একটি এলএমজির সামনে পড়ে গিয়ে শাহাদাত বরণ করে।

সেদিন আমাদের অপারেশন সফল হয়। বাম দিক হতে জাহাঙ্গীরের দল এগিয়ে যেতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে পিছু হটে আসে। স্থানটি ছিল বনাঞ্চল। আমাদের সাথে কোনো রেডিও যোগাযোগও ছিল না। জাহাঙ্গীরের পিছু হটে আসার কথা আমরা ডান দিক থেকে কোনো খবর পাই নি। এমনি সময় হঠাৎ দেখি আমার ছেলে নদিম দৌড়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনারা এক্ষুনি পিছনে হটে না গেলে শত্রুপক্ষ আপনাদেরকে পিছন থেকে ঘিরে ফেলবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইদ্রিসকে আদেশ দেই তার দল নিয়ে পিছু হটে আসতে। অবশ্য সপ্তাহ দুয়েক পরে নির্ভরযোগ্য ছেলেদের সাহায্যে শত্রুপক্ষের তথ্যাদি সংগ্রহ করে আমরা আবার অপারেশনের মাধ্যমে বোয়ালিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হই।

দুর্বল শত্রুপক্ষ সম্ভবত ভয় পেয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করে। সকাল সাতটার দিকে ইউনিয়ন সদস্যের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় লোকদের জেরা করতে শুরু করি। মিনিট দশেক জেরার পরে দেখলাম বাড়ির অন্দরমহল থেকে বেড়া পার হয়ে প্রচণ্ড ঘোমটা টেনে এক মহিলা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমার স্বামী আপনাদের সব প্রশ্নের সদুত্তর দেয় নি। হানাদার বাহিনীরা কয়জন ছিল, কোথায় কোথায় ছিল, কী তাদের পরিধান ছিল এবং স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের আচার-আচরণ কেমন ছিল সবই আমাদের বললেন। অবশ্য মহিলার ইউনিয়ন মেম্বার পর্যায়ের স্বামী কয়েকবার উচ্চ কণ্ঠে স্ত্রীকে ভিতরে যাবার নির্দেশ দিলে আমাদের ধমক খান। আমরা অবাক হলাম যে কেমন করে এক মহিলা তার স্বামীকে উপেক্ষা করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে আমাদেরকে তথ্য দেওয়ার সাহস পেলেন। এই মেম্বারকে আমাদের গেরিলারা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যা কিনা হত নেহায়েতই অন্যায়। তবে আমরা যাবার সময় জানিয়ে গেলাম যে সত্য কথা বলার জন্য যদি তার স্ত্রীর উপর কোনো আঁচড় পড়ে তা হলে আমরা তাকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলব। ঘটনা নেহায়েত বিরল। মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে কী করে এক অজানা গাঁয়ের গৃহিণী সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে স্বামীকে বলতে গেলে অস্বীকার করলেন, কোনো পরিণতির কথা না ভেবে। হতে পারে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে হাজারও মা-বোন স্বপ্রণোদিতভাবে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাদের এই সাহসিকতার কথা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখ থাকা উচিত।

আমাদের প্রথম অপারেশনে ভদ্র পদবী নামক এক সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লে. যোগদান করেছিল। তাকে মাঠে প্রশিক্ষণ দেবার জন্যই জাহাঙ্গীরের দলের মধ্যে ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম। ব্যর্থ অপারেশনের পরে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসি। তার দুএকদিন পরেই লে. ভদ্র কোন এক পূজার অজুহাতে একদিনের ছুটি নিয়েছিল। তার কিছু স্বজনেরা নাকি ভারতীয় দিনাজপুর শহরে ছিল। এই লে. আর কোনোদিন ফিরে আসে নি। আজ ত্রিশ বছরের মধ্যে তার কোনো সন্ধানও পাই নি।

এ ঘটনা পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে, বাঙালি হিন্দু মাত্রই ভীরু। মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের কারো কারো কাপুরুষতার কথা আমি আগেই লিখেছি। আমাদের রিক্রুটিং পলিসি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অসচেতন যুবকদের স্বার্থান্বেষীরা-নির্বাচন করেছিল স্বজনপ্রীতিবশে বা রাজনৈতিক কারণে।

আমার সন্তান নদিম অক্টোবর ১৯৫৫-এ জন্মগ্রহণ করে এবং পরিবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গোপনে যুদ্ধে যায়। '৭২ সালে তার সাথে তার মায়ের কথাবার্তা হচ্ছিল রণক্ষেত্রের ভয় পাওয়া নিয়ে। বলেছিল, ভয় কি আর লাগে না, সবারই লাগে, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সৈনিকেরা মানুষ থেকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যান্ত্রিক পর্যায়ে চলে যায়। শত্রুকে মারতে হবে নয়তো নিজেকে মরতে হবে। এ ছাড়া মনে উদয় হত রণক্ষেত্রের পেছনে হাসপাতালে তার মা ও বোনদ্বয় রয়েছে, তাদের কী হবে। সুতরাং তার চিন্তায় একটি পথ উন্মুক্ত। শত্রুকে পরাজিত করা। এটা ছিল নদিমের ব্যাখ্যা। প্রতিটি সৈনিকই নিজস্ব ব্যাখ্যায় যুক্তি দিয়ে দেখে, রণক্ষেত্রে সে কী মনোভাব নিয়ে শত্রুকে মোকাবিলা করবে।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা যখন উঠল তখন আরো কিছু কথা মনে পড়ে। প্রেম সিং-এর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে প্রশ্ন আসল, আমরা কেন হিন্দু বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে দিচ্ছি না? জানালাম যে রিক্রুটিং পলিসি সেক্টর কমান্ডারের হাতে নাই। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দই এই দায়িত্ব নিয়েছিল। সম্ভবত ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চাপে তিনি আমাকে সেক্টরের পক্ষ থেকে দিনাজপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু যুবকদের রিক্রুট করার পরামর্শ দেন। একজন ভারতীয় মেজর এবং দিনাজপুরের স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

আমরা সম্মিলিতভাবে দিন তারিখ ঠিক করে ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাই। কেন্দ্রে আমাকেই প্রথম সম্ভাষণ দিয়ে যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পরে স্থানীয় নেতা ও মেজর তাদের বক্তব্য রাখেন। আমাদের পরিকল্পনা সফল হয় নি। শরণার্থীদের বক্তব্য ছিল যে বাঙালি মুসলমানরা পাক হানাদারদের মতো আচরণ করেই তাদেরকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সুতরাং তাদের যুবকেরা কীভাবে মুক্তিবাহিনীর মুসলিম সদস্যের মধ্যে থাকতে সাহস পাবে। আমার দুই সঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার কথা উপস্থাপনা করতে নিষেধ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে বহু যুক্তি তুলে ধরেন। দুঃখজনক এই যে, আমাদের ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সফল হয় নি। শরণার্থীদের মধ্যে একটি যুবকও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহ দেখায় নি।

আমার সেক্টরে ১৪/১৫ হাজার মুক্তিবাহিনী সদস্য ছিল। এদের তালিকা প্রায়ই আমার হাতে পড়ত। গোটা দশেকের বেশি হিন্দু যুবকের নাম এই তালিকায় দেখি নি। তবে এখানে একটা কথা আছে। তালিকায় মুসলমান ছেলেদের বংশের পরিচয় থাকত না। হিন্দু যুবকেরাও তাদের পদবি ব্যবহার করত না। বাংলাদেশী ছেলেদের অনেকে এক নামেই পরিচিত ছিল। আর এসব নাম হিন্দু মুসলমান উভয়েরই হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা কোনো প্রশ্ন করতাম না। সম্ভবত বেশ কিছু হিন্দু যুবক মুসলমান যুবকদের সঙ্গী হয়ে আমার বাহিনীর মধ্যে ছিল। বিজয় দিবসের পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেটের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা একসময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পরিণত হয়। এ কারণে '৭২ সালের পরে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সেক্টর কমান্ডারের স্বাক্ষর নেওয়ার নিয়ম চালু হয়। আজ অবধি আমি মুক্তিবাহিনীর শতাধিক হিন্দু সদস্যের সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছি, তবে প্রমাণসাপেক্ষে।

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আরেকটি কথা মনে পড়ে। আমি রণাঙ্গনে চলে যাই আমার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়কে কলকাতা শহরের নিকটবর্তী কল্যাণী নামক এক উপশহরে রেখে। '৭১-এর মার্চ মাস থেকে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় এই উপশহরে আশ্রয় নিতে নিতে প্রায় লক্ষাধিকে পৌঁছায়। আমার পরিবার কলকাতা শহরে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে রাজি ছিল না। সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হতে তারা উদগ্রীব ছিল। কলকাতার ভদ্র সমাজ যেখানে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তারা আমার ও লে. কমান্ডার উদ্দিন পরিবারকে কল্যাণীতে গিয়ে শরণার্থীদের সেবা করার পরামর্শ দেন। পরে দেখা যায় এখানে হিন্দু ব্যতীত মুসলমান কোনো শরণার্থী ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আমার পরিবার আদৌ বিচলিত না হয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের জন্য ছোট একটি বাড়িও বরাদ্দ করা হয়েছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। কোনো একসময়ে জানাজানি হয় পরিবারগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এতে শরণার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ করে যে, তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই আমাদের পিটিয়ে এবং অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে শরণার্থীতে পরিণত করেছে। তোমরা কী সাহসে আমাদের সেবা করতে এসেছ। স্থানীয় অধিবাসীরাও শরণার্থীদের পক্ষ নিয়ে আমার পরিবারের বাসস্থল, যেখানে কিনা আরো কিছু মুসলমান মহিলা ছিল, সেটা আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেয়। বিষয়টি স্থানীয় ভদ্র সমাজে জানাজানি হয়ে যায়। ফলে তাদের হস্তক্ষেপে এদের সকলকে রাতের অন্ধকারে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কেবল হিন্দুরাই যে সাম্প্রদায়িক ছিল তা নয়। কলকাতা শহরে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু স্বজনেরা ছিল, যারা ভারত বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে আসে নি। এদের অভিযোগ ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। মুক্তিবাহিনী নাকি ভারতের প্ররোচনায় পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে এসেছে। ভুল বোঝাবুঝির অজস্র ঘটনা '৭১-এ ঘটেছিল। তবে আমি অপ্রীতিকর দুর্ঘটনার কথা কোনো দিন শুনি নি। এটা হওয়া উচিত ছিল না। এর অন্যতম কারণ হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রচার অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল।

২৫ মার্চের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা যুদ্ধ কেন ও কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা স্থানীয়ভাবে এবং শরণার্থী কেন্দ্রে যথেষ্ট প্রচার করা হয় নি। বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রে একাধিক বুদ্ধিজীবী ও অভিজ্ঞ আমলা ছিলেন যারা স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের অবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে মগ্ন ছিলেন। তাদের সমন্বয়ে যুদ্ধকালীন সময়ে একটি প্রপাগান্ডা বিভাগ গঠন করা উচিত ছিল। তথ্যের অভাবে বিতর্ক ভিন্ন পথ ধরে এবং আবেগপ্রধান হয়ে ওঠে। শরণার্থীদের মধ্যে যদি তথ্য প্রদানের পাক্ষিক বা মাসিক প্রচার ব্যবস্থা চালু করা হত তা হলে সাম্প্রদায়িকভাবে প্রশ্ন উঠত না।

১৯৭১-এর রাজাকার বাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু ভুল ধারণা ছিল। বিভিন্ন সাব-সেক্টরে সীমান্তে লড়াইয়ে বেশ কিছু রাজাকার বাহিনীর সদস্য আমাদের হাতে ধরা পড়ত। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করত। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে তারা স্বেচ্ছায় রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করবে। পাকিস্তানি প্রশাসন টাউন ও গ্রামের পরিবারের ওপরে চাপ দিত তাদের ছেলেদের রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য। অন্যথায় পরিবারবর্গের ওপরে নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড কার্যকর করা হত।

মোহেদীপুরের এক অপারেশনে ইদ্রিসের সদস্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আঁধার-আলোর পরিবর্তনের সময়। এই সময়ে হঠাৎ রাজাকার বাহিনীর এক সদস্য একটি সাদা শার্টকে ফ্ল্যাগ হিসেবে ব্যবহার করে ইদ্রিসের কাছে আসে এবং বলে যে ইদ্রিসের অগ্রগতির পথে বেশ কিছু রাজাকার পাকিস্তানি পুলিশদের নেতৃত্বে শক্ত ঘাঁটি বেঁধে বসে আছে। লে. ইদ্রিস যদি এই পথে যায় তা হলে তারা মুক্তিবাহিনীর ওপরে গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হবে। অন্যথায় পাকিস্তানিরা এসব ছেলেদের প্রতি নির্যাতন করবে। এই পতাকাধারী ইদ্রিসকে পরামর্শ দেয় ইদ্রিসের বাহিনী যেন তাদের ডানে ও বামে সরে গিয়ে অগ্রসর হয়। ইদ্রিস এই পরামর্শ গ্রহণ করাতে সেদিন মুক্তিবাহিনীর কেউ হতাহত হয় নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে রাজাকার বাহিনীর মধ্যেও অপরাধবোধ ছিল এবং কখনো কখনো মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার প্রবণতা ছিল।

সেক্টরের তিন চার মাসের অপারেশনে শতাধিক রাজাকার সদস্য আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। পরে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে অস্ত্র ব্যতীত কোনো রাজাকারকে যেন আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া না হয়। ফলে অস্ত্রধারী রাজাকাররা পরবর্তীকালে আত্মসমর্পণ করত। এই সব রাজাকারদের আমি তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে আটক রেখেছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে হেডকোয়ার্টারে এসব রাজাকার সদস্যদের নতুন করে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। এদের নিয়ে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়। লে. সাইফুল ইসলাম ও লে. কাউসার ভারতের প্রশিক্ষণ নিয়ে সাত নম্বর সেক্টরে যোগদান করে। এই দুই অফিসারের অধীনে প্রাক্তন রাজাকার দুই কোম্পানি দিনাজপুরের পশ্চিম অঞ্চলে সাহসিকতার সাথেই যুদ্ধ করে।

বেশ কিছুদিন পরে বিভিন্ন সাব-সেক্টরের রিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে অপারেশনের পরবর্তীকালে প্রাক্তন রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা উধাও হয়ে যেত এবং এটাও দেখা যায় যে আমাদের পরিকল্পিত অপারেশনে বেশ কিছু ব্যাঘাত ঘটত। আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, পাক হানাদার বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিশ্বস্ত রাজাকারদের আমাদের বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিত গোয়েন্দাগিরির কাজ করার জন্য। এরপর থেকে আমি সাব-সেক্টরগুলি রাজাকারদের আত্মসমর্পণ গ্রহণকালে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেই।

বন্দি রাজাকারদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের আচরণ আমাকে জানানো হয় নি এবং জানতেও পারি নি। এই সংক্রান্ত আমার ছেলে নদিমের কাছ থেকে একটি ঘটনা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হই। সে প্রত্যক্ষদর্শী যে, বন্দি রাজাকারদের আমাদের ছেলেরা অনেক সময় নির্জনে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলত। চোখ উপড়ানোর একটি দৃশ্য দেখে সে খুব বিচলিত হয় এবং আমাকে রিপোর্ট করে। আমিও খুব ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হই। সাব-সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। আমাদের সদস্যরা যেন আন্তর্জাতিক কনভেনশন মেনে চলে এবং বন্দিদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়। সকলকে মনে রাখতে বলা হয় যে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করছি এবং পাক হানাদার বাহিনী গণহত্যায় নিয়োজিত, যুদ্ধের নিয়মকানুন তারা মানে না। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, যুদ্ধে অসংখ্য অমানবিক কার্যক্রম ঘটে থাকে যা কমান্ডারদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষ থেকে যেন এরকম ঘটনা না ঘটে সেই উপদেশই কমান্ডার ও গ্রুপ লিডারদের দেওয়া হয়েছিল।

বাঙালিরা যে খুব সাহসী ও বীর এমন কোনো তথ্য জানা নেই। অবশ্য ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম বাঙালি বিজয় সিংহ নাকি লঙ্কা জয় করেছিল। এ ছাড়া বাঙালির আর কোনো অভিযান বা যুদ্ধ জয়ের কথা আমি জানি না। মোগল আমলে নবাবেরা রাজত্ব করে গিয়েছে বটে, তবে তাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভাড়াটিয়া সৈন্য ছিল। তবে সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাপ্রধান ছিলেন মোহনলাল। তার বংশ পরিচয় আমার জানা নেই। এত কথা লেখার কারণ হচ্ছে বাঙালিরা সচরাচর খুব শান্ত, আবার তারা নিরস্ত্র ও অসহায় ব্যক্তির ওপরই জুলুম অত্যন্ত নৃশংসভাবে করে থাকে। বাঙালির এই চরিত্রের কারণে ব্রিটিশ আমলে বাঙালিদের নিয়ে কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয় নি। তবে 'বেঙ্গল ল্যান্সার নামক' এক অশ্বারোহী বাহিনীর কথা ব্রিটিশ আমলের ইতিহাসে পাওয়া যায়। এরা কেউ বাঙালি ছিল না।

তবে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়। লাহোরের নিকটবর্তী খেমকারান অঞ্চলে পাঞ্জাবি, পাঠান ও বাঙালি ব্যাটালিয়নদের লাহোর শহর রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও ট্যাঙ্কবাহিনী ব্যবহারে পাঞ্জাবি ও পাঠানরা রণভঙ্গ দিয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহিরা অত্যন্ত সাহসের সাথে এই আগ্রাসন নিষ্ফল করে দিয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুষ্ঠু ট্রেনিং ও সাহসী নেতৃত্ব দিলে এবং দেশ রক্ষার জন্য মনোবল সৃষ্টি করলে বাঙালি

সিপাহিরাও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে। এই বাঙালি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল এ টি কে হক।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদের কে, জেড ও এস ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নিয়মিত বাহিনী। কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ স্কুল–কলেজের ছাত্র এবং কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়, যাদের দায়িত্ব ছিল গেরিলা যুদ্ধ করা। এদেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে শত্রুপক্ষের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা বিনষ্ট করার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিল। সম্মুখযুদ্ধ এরা এড়িয়ে যেত। অন্যদিকে পাকিস্তানিরাও সীমান্ত নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান নিতে ভয় পেত। কারণ আমাদের সদস্যরা তাদের সম্মুখীন না হলেও দেশের অভ্যন্তরে যুবকেরা তাদের পথঘাট, টেলিফোন ও ইলেকট্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করত। এর থেকেও বড় উপকার যা করত সেটা হচ্ছে পাকবাহিনী সংক্রান্ত খবরাদি আমাদের পৌঁছে দিত।

যুদ্ধকালীন সময়ে আমার সেক্টরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। মুক্তিবাহিনীর সদস্য থেকে আমাদেরকে গ্রুপ লিডার মনোনয়ন দিতে হত। এই সিলেকশন করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় ভুল হত। একটা গ্রুপের কথা মনে পড়ে। এই গ্রুপের লিডার হিসেবে মনোনয়ন করা হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স পড়ুয়া এক ছাত্রকে। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ফিরে আসে এবং তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে তাদের এক বচসাকালে আমি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হই। শুনতে পাই যে তারা তাদের টার্গেট বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি নেতার কারণে। এই গ্রুপে ছিল এক নিরক্ষর সাঁওতাল জোয়ান। তার উৎসাহ ও কৌশল, ভয়ভীতির কারণে নেতা গ্রহণ করতে পারে নি। দলের অন্য সকলে এই সাঁওতাল জোয়ানকে লিডার বানিয়ে পুনর্বার একই টার্গেটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কলেজের ছাত্রটিও এই প্রস্তাব হাসিমুখে মেনে নেয়। দলের সকলের মতে কলেজের ছেলেটি নিরাপত্তার এবং থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় দক্ষ থাকলেও শত্রুপক্ষের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যেতে ভয় পেত। সকলেই মেনে নিল যে সাঁওতাল যুবকটিকে অ্যাকশন করার জন্য লিডার বানানো হোক এবং কলেজের ছাত্রটিকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হোক।

এটি তো মাত্র একটি ঘটনা। এরকম আরো ঘটনা ঘটে। দলের সদস্যরা নিজেরাই তাদের লিডারদের রদবদল করে নিত। এই নীতি সকলের জন্যই মঙ্গল ছিল। সশস্ত্র বাহিনীতে আন্তর্জাতিক এক প্রবাদ আছে : সুপারিশে পদোন্নতি নয়, সিপাহিরা যাকে ভালো গণ্য করে সেই ভালো অফিসার।

পাকিস্তান বাহিনী সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ে বুঝতে পারল তাদের সীমিত নিয়মিত বাহিনী দিয়ে সর্বত্র শক্তিশালী ঘাঁটি বানাতে পারবে না। আমাদের গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা বলতে গেলে সকলেই নিজ নিজ এলাকায় অ্যাকশনে যেত। হানাদার বাহিনীর

অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তাদের জন্য আদৌ কষ্টকর ছিল না। উপরন্তু দেশবাসী সকলেই বিশেষ করে কৃষক, কামার, কুমার, জেলে মেহনতি মানুষদের গেরিলা বাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। বাদ সাধত স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিয়ে। এদের মধ্যে দুএকজনকে পাওয়া যেত যারা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল। এরাই ছিল "শান্তি কমিটি"-র সদস্য এবং এরা মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশের কথা হানাদারদের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিত এবং আশ্রয়কারীদের নাম বলে দিত। এটাই ছিল আমাদের জন্য বিপজ্জনক ও অস্বস্তিকর এবং বেদনাদায়ক। কারণ পরবর্তীকালে পাকবাহিনী আশ্রয়দানকারী গরিব মানুষদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিত ও গৃহস্বামীকে নির্যাতন করত। এর ফলে শান্তি কমিটির সদস্যদের মেরে ফেলার নির্দেশও দিতে বাধ্য হতাম। বিশ্বাসঘাতকদের এসব শাস্তি না দিয়ে উপায় ছিল না।

স্বাধীনতা যুদ্ধ-উত্তরকালে রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেসব ছেলে শান্তি কমিটির সদস্যদের হত্যা করছিল, তাদের সমক্ষে হত্যার অভিযোগও এনেছিল। দারোগাদের ভ্রান্ত ও কুপরামর্শের জন্য এই ধরনের মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ গ্রামও পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরকম ভুল নীতি অপ্রত্যাশিত ছিল। বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জনের পরও পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন লোকজনের কোনো অভাব ছিল না। এই দায়িত্ব তৎকালীন সরকারের ওপরেই পড়ে। '৭১-এ যারা দায়িত্ব পালন করেছিল, '৭২-এর পরে তারা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে শুরু করে।

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ভারতে প্রবেশকৃত বাঙালি হিন্দু শরণার্থী নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। তেমনিভাবে ভারতের সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের জনগণের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছিল। আনুমানিক '৭১-এর ডিসেম্বরের ১/২ তারিখের একটি ঘটনা মনে পড়ে। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বগুড়া অভিযানে ভারতীয় সৈন্যদের নিরাপদ পথ দেখিয়ে ভারতীয় ট্যাঙ্কবাহিনীকে অগ্রসর হতে সাহায্য করছিল। আমি তাদের পরিদর্শন করতে যাই। পথিমধ্যে এক গ্রামে পৌঁছে দেখি যে গ্রাম উজাড়। গোটা দশেক স্থানীয় মাতব্বরদের একটি বেড়ার ঘরে, সম্ভবত সেটাকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল, বসে থাকতে দেখি। আমার জিপ থামিয়ে তাদের কাছে যাই। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি আমার পরিচয় দেই। তাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ মনোভাব দেখে বুঝতে পারলাম আমি অবাঞ্ছিত। তারা অভিযোগ করল যে, ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে আমরা কেন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছি। তারা জানতে চাইল দেশবাসী কি মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছিল না? মুক্তিবাহিনী কি নিজ চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করতে পারত না? ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে গ্রামবাসী নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। সশস্ত্র যুদ্ধের অনেক ইতিহাস মনে পড়ল। ভিনদেশী সিপাহিদের অসামাজিক ব্যবহার হয়েই থাকে। এ ছাড়া হয়তো মাতব্বররা মনে করছিল যে ভারতীয় সৈন্যরাই পাক হানাদার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হবে। এ ধরনের মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের ওপর ভারতীয়দের সম্ভাব্য কর্তৃত্ব তাদের মনে উদয় হওয়া

অস্বাভাবিক ছিল না। এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ধর্মীয় বিভেদ।

পরিদর্শনের ফিরতি পথে সন্ধ্যার দিকে আকস্মিকভাবে ভারতীয় ডিভিশনের জেনারেল লাছমান সিংহ লেহালের সঙ্গে আমার দেখা হয়। কথা আদান-প্রদানের পর বিদায় নেওয়ার সময় জানালেন যে, কোনো এক কুটির থেকে দশটি যুবতীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরা সবাই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী ছিল। হানাদার বাহিনী এদের ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। আমি এই মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেই। জেনারেল সাহেব জানালেন যে, এই ছাত্রীদের ইতিমধ্যেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাত নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল তরঙ্গপুর। তরঙ্গপুর ভারতীয় দিনাজপুরের সদর থানায় অবস্থিত। রাস্তাঘাট পাকা ছিল এবং থানা হেডকোয়ার্টারের দূরত্ব এক মাইলের মধ্যেই। এখানে এক নির্জন আমবাগানে যার মধ্য দিয়ে একটি পাকা রাস্তা চলে গিয়েছিল, হেডকোয়ার্টার গড়ে তোলা হয়েছিল।

মেজর নাজমুল হুদা সর্বপ্রথম যখন এই হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন সেটি ছিল অন্যত্র। তার কমান্ডকালে তিনি নিজেই হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করেন। আশপাশে ভারতীয় বসতি ছিল না। এলাকাটি ছিল নির্জন। ভারতীয় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের দূরত্ব বেশি ছিল না।

মেজর নাজমুল হুদা হেডকোয়ার্টারটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিস্তার করেছিলেন। আমাকে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হয় নি। হেডকোয়ার্টারে হুদা ছাড়াও আরো দুজন অফিসার ছিলেন। সম্ভবত তারা আনসার বাহিনীরই সদস্য থেকে আসেন। তাদের বসতবাড়িও সীমান্ত থেকে বেশি দূরে ছিল না। এদের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা আমি পরিবর্তন করি। মেজর মকসুল চৌধুরী যিনি পাকিস্তান আমলে পেশায় ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ডাক্তারের জন্য একটি আলাদা তাঁবুও ছিল। তবে তিনি ডাক্তারি পেশায় কর্মরত থাকার তেমন সুযোগ পান নি। কারণ সাব-সেক্টরে আহতরা নিকটবর্তী ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। তরঙ্গপুর নিয়ে আসার জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হত না। তবে মনে হয় আমি তাকে সাব-সেক্টর চিকিৎসা বিভাগ পরিদর্শন করার জন্য কয়েকবার পাঠিয়েছিলাম। এই ডাক্তার সাহেবের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা জন্মায়। কোনো দায়িত্ব তিনি এড়াতেন না। মেজর নাজমুল হুদার মৃত্যুর পর বলতে গেলে তিনি সাত নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার পরিচালনা করতেন। কারণ আমি একটা নিয়ম চালু করেছিলাম। প্রতি রাতেই কোনো-না-কোনো সেক্টরে রওনা হয়ে ভোরবেলা সেখানে পৌঁছতাম এবং সারা দিন তাদের সাথে কাটাতাম এবং দিন শেষে আবার হেডকোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করতাম। অর্থাৎ যুদ্ধের সময়কালে আমার প্রায় রাতগুলি রাস্তায় কাটাতাম।

সাত নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার আদৌ Tactical হেডকোয়ার্টার ছিল না। সাব-সেক্টর ও হেডকোয়ার্টারের মধ্যে কোনো টেলিফোন বা বেতার যোগাযোগ ছিল না। এমনকি সাব-

সেক্টরে কোনো জিপও ছিল না, জরুরি সংবাদ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেবার জন্য। যুদ্ধ পরিচালনায় এটিই ছিল মস্ত বড় একটা অন্তরায়। তবে মাঝে মাঝে সাব-সেক্টরের নিকটবর্তী ভারতীয় অবস্থান থেকে যদি কোনো জরুরি সংবাদ থাকত সেটা প্রেম সিঙের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছানো হত। মোট কথা এসে দাঁড়ায় যে, মেজর নাজমুল হুদা ডাক্তার মেজর মকসুল চৌধুরীর সাহায্যে হেডকোয়ার্টারের সব দায়িত্ব পালন করতেন। আর আমি চেষ্টা করতাম সাব-সেক্টরের অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণ করতে।

আমার অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধিত্ব করতেন মেজর হুদা এবং ভারতীয় ব্রিগেড, ডিভিশন ও 'কোর' হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে আমি ভারতীয় ডিভিশন ও 'কোর' হেডকোয়ার্টারে যেতাম। এরকম একটি মিটিঙে কোর হেডকোয়ার্টার থেকে আমার ডাক পড়ে। আমি তরঙ্গপুরে না থাকায় মেজর হুদা এর দায়িত্ব নেন। যাত্রাকালে ভারতীয় নৌবাহিনীর এক লে. কমান্ডারকে হুদার সাথে দেওয়া হয়। হুদা নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। এই রাস্তায় ড্রাইভ করতে খুবই মজা লাগত। রাস্তা ছিল ভালো ও প্রশস্ত। জিপের এক্সেলেটর পুরো দাবিয়ে জিপ চালাতাম। সম্ভবত মেজর হুদাও আমার মতো জিপ চালাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই অ্যাক্সিডেন্টে মেজর ও লে. কমান্ডার সাহেবদ্বয় মৃত্যুবরণ করেন। আমি সকাল ১১/১২টার দিকে ফিরে এসে প্রেম সিঙের কাছ থেকে এ সংবাদ পাই। আমাকে বলা হয়েছিল শহীদ হুদার লাশ শিগগিরই তরঙ্গপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ দুঃসংবাদটি কোনো-না-কোনোভাবে দিনাজপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাদের অনেকেই দ্রুত আমার হেডকোয়ার্টারে চলে আসেন।

আমি হেডকোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তনের ঘণ্টা দুয়েক আগেই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ সংবাদ পান। শহীদ মেজর নাজমুল হুদার পরিবার দিনাজপুরে একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। সমবেত নেতৃবৃন্দ আমার অপেক্ষায় ছিলেন এই মৃত্যু সংবাদটি হুদার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে। প্রথমে আমি একটু রাগই করলাম কেন এই সংবাদ দু ঘণ্টার মধ্যে হুদার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। বুঝলাম যে বেদনাদায়ক সংবাদটি পৌঁছে দিতে সকলে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাজটি আমাকেই করতে হল। কীভাবে এ খবরটি হুদার স্ত্রীর কাছে পৌঁছাব এবং কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেব তা আমি শতবার মনে আওড়িয়েও কূলকিনারা পাই নি। এ দৃশ্যের বর্ণনা এতই মর্মান্তিক ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

তরঙ্গপুরে আমি আসার আগে শহীদ মেজর হুদা সপরিবারে বহুদিন মালদা সার্কিট হাউসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি সসম্মানে ছিলেন। তাকে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় রাজশাহীর সোনা মসজিদে দাফন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পরিষ্কার ও গোসল দেওয়ার পরই তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যখন জানতে পারল যে তার লাশ সার্কিট হাউসে এলে গোসল দেওয়া হবে তখন তারা বেঁকে বসল। কোনো প্রকারেই তারা মুসলমানের

মৃতদেহকে সার্কিট হাউসে আনতে দেবে না। সার্কিট হাউস সংলগ্ন ছিল মালদা ডিসির সরকারি বাসস্থান। আমি তার অনুমতি লাভের জন্য দুএকজনকে তার কাছে পাঠাই। তিনি সম্মতি দিতে রাজি হলেন না। তখন আমি নিজেই তার কাছে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমাকে জানানো হল যে ডিসি সাহেব ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হলাম। সার্কিট হাউসের বাথরুমে এই লাশটি ধোয়ার উদ্যোগ স্থানীয় হিন্দু কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় কারণে নাকচ করে দিয়েছিল।

কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের জন্য এবং শান্তি রক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজসেবী মৈত্রেয়ী দেবী বোধহয় এর প্রধান ছিলেন। তার মুখে বহুবার মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক আচরণের কথা শুনেছি। কোনো একসময় কলকাতায় পৌঁছে এই ঘটনাটি তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব গৌরী আইয়ুবের কাছে বর্ণনা করি। আমাকে কেবল সমবেদনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক তদন্ত বা কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে আমি জানি না।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমরা শহীদ মেজর নাজমুল হুদার লাশ মোহেদীপুর সাব-সেক্টরে নিয়ে যাই। তার পরিবারকেও সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শবদেহ দেখানো হয় এবং মাগরেবের পরে এই লাশের সমাধি দেওয়া হয়। এই লাশের জানাজায় মুক্তিযোদ্ধাসহ শত শত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশ নেয়। তার পরিহিত বসনে তাকে দাফন করা হয় যা কিনা শহীদদের বেলায় প্রযোজ্য।

লিখছিলাম সেক্টর তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে। হঠাৎ করে আমাদের সকলকে দুঃখপীড়িত করে অসময়ে নাজমুল হুদা চলে গেলেন। তার সাহায্য, দক্ষতা ও সহযোগিতা কেমনভাবে পূরণ হবে তাই ভাবছিলাম। মেজর ডা. মকসুল চৌধুরী নিজের থেকেই ক্রমশ নাজমুল হুদার দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তিনি যে তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমি এখনো স্মরণ করি। তার মতো এক অফিসার এসব দায়িত্ব না নিলে সেক্টরের অ্যাকশন প্রোগ্রাম ব্যাহত হত।

রসদ সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা হেডকোয়ার্টারে এবং সাব-সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের গুনে গুনে রসদ সরবরাহ করত। কিন্তু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী সদস্য ব্যতীত কিছু বাড়তি সংখ্যক যুবক আশ্রয় নিত। তাদের আশ্রয় না দিয়েও উপায় ছিল না। এই বাড়তি সংখ্যকদের ক্রমান্বয়ে ইয়ুথ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতাম। তবে কোনো সাব-সেক্টরে খাদ্যের অভাব হত না পারস্পরিক সহানুভূতির কারণে। এ ছাড়াও ছেলেদের মুক্তাঞ্চলে মাছ ধরার সুযোগ ছিল, যা হাসিমুখে স্থানীয়রা অনুমোদন করত। তবে কী কারণে জানি না কয়েকটি সাব-সেক্টরে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। আর এই রোগের উৎস সবুজ শাকসবজির অভাব। কিন্তু এই অভাব যে কেন স্থায়িভাবে পূরণ হয় নি তা অনুমান করা মুশকিল। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে এগুলো পাওয়া যেতে পারত। এই ব্যাধির ওষুধ আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করেও সংগ্রহ করতে পারি নি, কলকাতা থেকে আনতে হয়েছিল।

সময় যত অতিবাহিত হচ্ছিল আমাদের গেরিলা অ্যাকশনও তেমন বেড়ে চলছিল। পাক অক্সিলারি বাহিনীর সাথে সীমান্ত সংঘর্ষ বেড়ে চলছিল। সুতরাং হতাহতের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। মোহেদীপুরে মোয়াজ্জেম নামক এক ডাক্তার অকল্পনীয় পরিশ্রম করে এদের সেবাশুশ্রূষা করত। তবে ওষুধপত্রের ঘাটতি দেখা দেয় এবং ব্যান্ডেজেরও অভাব হয়। এরও প্রতিকার ভারতীয় সিভিল সার্জনদের কাছে পাই নি। এই পরিস্থিতিতে আমি কলকাতায় অবস্থানরত আমার স্ত্রীকে সংবাদ দেই। ওষুধপত্রাদি ছাড়াও ক্রমশ শীত নামার ফলে গরম কাপড় ও কম্বলের অভাব দেখা দেয়। এই সংবাদ আমার স্ত্রী কোনো এক সুযোগে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি কর্নেল লুথরাকে জানায়। কর্নেল লুথরা নিজস্ব দায়িত্বে তাৎক্ষণিকভাবে দুই ট্রাক বোঝাই কাপড়চোপড় ও ঔষধাদি আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় এবং সে কোনো সময় অপচয় না করে এইসব সামগ্রী আমার হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় একইসঙ্গে আমার স্ত্রী সুলতানা ও কন্যাদ্বয় নায়লা ও লুবনা ট্রেনযোগে মালদায় পৌঁছে আমার সাথে যোগাযোগ করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি তাদের তিন জনকে মোহেদীপুর সাব-সেক্টরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের হাতে সঁপে দিয়ে আসি।

আমার পরিবার সোনা মসজিদের মুক্ত এলাকায় অবস্থান নেয় এবং কন্যাদ্বয় ডা. মোয়াজ্জেমের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। আমার মেয়েরা কোনোদিনই রোগাক্রান্তদের সাথে কাজ করে নি, আহত ব্যক্তিদেরও দেখে নি। শুনেছি তাদের সামনে আহত সদস্যদের হাত বা পা এমপিউট অর্থাৎ কেটে ফেলা অপারেশনের সময় মোয়াজ্জেম সাহায্য চাইলে তারা সম্মত হতে পারে নি। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। ডা. মোয়াজ্জেম তাদের বেশ ভালো একটা লেকচার দিয়ে এসব কাজে তাদের সহযোগী হিসেবে সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে হোসেন নামক আরো একজন ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে অফিসারের পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাকে কোনো র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয় নি, দেবার কথাও না। এই যুবকটি বেশ কাজে উদ্যোগী ও আগ্রহী ছিল এবং সম্ভবত মকসুল চৌধুরীর দায়িত্ব লাঘব করতে সক্ষম হয়। তার বেশি কথা বলার অভ্যাস থাকায় সেক্টরের অফিসাররা তাকে নিয়ে কৌতুক করত। এ কারণে আমি অন্য অফিসারদের কয়েকবার ধমকও দিয়েছিলাম।

সেক্টর হেডকোয়ার্টার শৃঙ্খলাবদ্ধই ছিল এবং একটি ছাড়া কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে। মনে রাখতে হবে ভারতীয় দিনাজপুরে মুসলমানদের বসবাস ছিল। আমাদের কোনো এক সদস্য এদের থেকেই গো-মাংস ক্রয় করে হেডকোয়ার্টারে রান্না করেছিল। এটি নিয়েই ভারতীয় সিগন্যাল বিভাগের এক শিখ অপারেটর আপত্তি করে দারুণ হইচই শুরু করে দেয়। ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিং ও আমার হস্তক্ষেপের ফলে সমস্যার সমাধান হয়।

সাত নম্বর সেক্টরে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ অফিসারদের। আর্টিলারি মেজর নাজমুল হুদাই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র। তার অকালমৃত্যু সেক্টরের

ওপর বেশ প্রভাব ফেলে যা আমি আগে উল্লেখ করেছি। মেজর ডা. মকসুল চৌধুরী যথাসম্ভব এই অভাব পূরণ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। মেজর গিয়াস ছিলেন পাকিস্তানের ফন্টিয়ার্স ফোর্স রেজিমেন্টের সদস্য। আমি সেক্টরের দায়িত্ব নেবার আগেই তিনি নিজে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও মেজর নাজমুল হুদার সম্মতিক্রমে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে লালগোলায় তার সাব-সেক্টর স্থাপন করেন। আমি তাকে অন্যত্র পোস্টিং না করার পক্ষেই ছিলাম। হেডকোয়ার্টারের সাথে দূরত্ব এবং ফেরি পারাপারের সময় সাপেক্ষের কারণে আমি তাকে বিশেষ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। লালগোলার দক্ষিণে চারঘাটায় ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেজর রশীদ। তার অপারেশনের কার্যক্রমের দায়িত্ব মেজর গিয়াসের ওপর অর্পণ করেছিলাম। আমি যখন প্রথম সাত নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নেই তখন কেবলমাত্র একজন অফিসার লে. ইদ্রিস যিনি ছিলেন ইএমই কোরের সদস্য তাকে পেয়েছিলাম দিনাজপুর এলাকায়। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও সীমান্তে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে তিনি অসীম সাহস, বীরত্ব ও পদাতিক সৈন্যের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। উপরোক্ত অফিসার ব্যতীত পরবর্তীকালে আমি মাত্র একজন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে পেয়েছিলাম। বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরো ছয়জন অফিসারকে আমার সেক্টরে পোস্টিং করা হয়েছিল। সাত নম্বর সেক্টরে আনুমানিক চৌদ্দ হাজার সদস্য ছিল। এদের পরিচালনার দায়িত্বে প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসারবৃন্দের যথেষ্ট অভাব ছিল। এই অভাব পূরণ করা হয়েছিল যুব সম্প্রদায়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য গেরিলা বাহিনী থেকে আগত বেশ কিছু সদস্যদের দিয়ে। তাদেরকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল স্থানীয়ভাবে।

সাধারণ গেরিলা সদস্যদের ভারত কর্তৃপক্ষ মাত্র এক মাসের জন্য ট্রেনিং দিত। এই স্বল্প ট্রেনিং গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয়দের এজন্য দোষারোপ করা যায় না। আমাদের চাহিদা ছিল অসংখ্য। বাংলাদেশ কর্তৃক স্থাপিত যুবক্যাম্পে অসংখ্য যুবক প্রশিক্ষণের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছিল। এদের সকলকে ট্রেনিং দেওয়ার মতো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কারণ ভারতীয়রাও ভবিষ্যতে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অতএব বলা যায় ট্রেনিং সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয়রা আমাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

অতি স্বল্প সময় সমরাস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া দুরূহ ব্যাপারে। ট্রেনিংপ্রাপ্তদের বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্যোগী মনোভাব না থাকলে প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত হয় না। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ভ্রান্ত রিক্রুটিং পলিসির কারণে অনেক আকাটমূর্খ ট্রেনিঙের সুযোগ পায়, যারা স্বল্প সময়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। ট্রেনিঙের জন্য একটি কমিটমেন্ট তো লাগে। যারা কেবল খাওয়াদাওয়া আশ্রয় পাবার জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছিল তারা আমাদের কোনো কাজে আসে নি। বলা যায় যে হিতে বিপরীত হয়েছিল। এরা অযথাই গুলিবর্ষণ করত এবং শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া মাত্রই রণেভঙ্গ দিত।

অফিসারদের বেলায়ও স্বল্প শিক্ষার প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। সুশিক্ষিত হওয়ার কারণে এদের মান অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এদের অনভিজ্ঞতা ও স্বল্প বয়স্কতা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। তবে তাদের দেশাত্মবোধ এবং দায়িত্ববোধের উপকরণ থাকার কারণে অনেক অপারেশনে তারা দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

একদিন প্রেম সিং আমাকে ডেকে পাঠান এবং ভারতীয় রেগুলার বাহিনী কর্তৃক দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী একটি ঘাঁটিতে 'সেটপিস' অর্থাৎ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ করার বিষয়টি উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করেন আমার সাব-সেক্টরের কোনো মুক্তি ফৌজের এই অপারেশনে অংশ নিতে দক্ষতা আছে কি না। আমি এতে রাজি হই এবং লে. ইদ্রিসের নেতৃত্বের ট্রুপসদের অংশ নেবার জন্য মনোনীত করি। তবে প্রেম সিংকে বলেছিলাম যে ইদ্রিসের ফৌজকে যেন অগ্রণী বাহিনী হিসেবে না রেখে ভারতীয় বাহিনীর অ্যাটাকিং ফোর্সের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিয়োজিত করা হয়।

আমাদের অফিসারদের মধ্যে কেউ কোনো দিন 'সেটপিস' অ্যাটাকে অংশগ্রহণ করে নি। এমনকি এ সম্বন্ধে এদের জ্ঞানও নেই। ভারতের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল আক্রমণের দিনে অতি প্রত্যুষে ফাইটার বিমান পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর বোমাবর্ষণ করবে এবং এর পরপরই আর্টিলারি কর্তৃক 'ব্যারাজ' শুরু হবে। আর এই গোলাবর্ষণকালে ভারতীয় ট্যাঙ্ক এবং পদাতিক সৈন্যরা অগ্রসর হতে থাকবে। পাকিস্তান আমলে আমি এই যুদ্ধনীতি মহড়ায় অংশ নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবে দেখলাম যে, বছর দুয়েকের মধ্যে আমাদেরও এ ধরনের অপারেশন করতে হবে। এই কারণে প্রায় সব সেক্টরেই যতজন অফিসারকে দুএকদিনের জন্য স্পেয়ার করতে পারা যায় অর্থাৎ কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকে, তাদের সকলকে একত্রিত করে আমার জিপে বসিয়ে একটি ভান্টেজ পয়েন্ট থেকে ভারতীয়দের এই পরিকল্পিত আক্রমণ দেখার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।

ভারতীয় আক্রমণের আগের দিন রাত্রে সীমান্তে রাত্রিযাপন করে ফজরের নামাজের সময় সেখানে উপস্থিত হই। আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম এমনভাবে যে ইদ্রিসের বাহিনী এই আক্রমণে কীভাবে পারদর্শিতা দেখায় তা দেখা যাবে। সীমান্তে পৌঁছাবার পর কিন্তু ইদ্রিস ও তার বাহিনীর সাথে দেখা হয় নি। রাতের অন্ধকারে তারা ভারতীয় কমান্ডারের নির্দেশে অবস্থান নিয়েছিল।

সূর্য উদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে জঙ্গি বিমানের আওয়াজ পাওয়া যায় এবং তাদের বোমাবর্ষণের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে আমার সাথীরা সকলে কিছুটা বিস্মিত হয়। এর পরেই শুরু আর্টিলারি কর্তৃক গোলাবর্ষণ ও আক্রমণকারী ফৌজিদের সম্মুখমুখী অগ্রসর। ঘণ্টাখানেক কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না আক্রমণের অগ্রগতি ও সাফল্য। এই অপারেশনে পাকবাহিনী আর্টিলারি দ্বারা গোলাবর্ষণ করে নি, সম্ভবত তাদের গোটা চারেক ট্যাঙ্ক ছিল। আর এই ট্যাঙ্কগুলি শত্রুপক্ষ অর্থাৎ আমাদের দিকে ফায়ার করে যাচ্ছিল। পাকবাহিনী যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং তারা দীঘির পাড়ের অবস্থান থেকে সহজে

সরে যায় নি। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, ভারতীয়দের পাকবাহিনীর বাঙ্কারে বেয়নেট চার্জ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ কিনা হাতাহাতি যুদ্ধও হয়েছিল।

বেলা ৬/৭টার দিকে হঠাৎ দেখতে পেলাম মুক্তিবাহিনীর ৩ জন ছেলে একজনকে ধরাধরি করে আমরা যেখানে অবস্থান নিয়েছিলাম সেদিকে আসছে। আমাদের মধ্য থেকেও কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে আহত ছেলেটিকে এগিয়ে নেয়। আহত ব্যক্তি সজ্ঞানেই ছিল এবং আমাকে দেখে তার মুখে কিছুটা হাসি ফোটে। ইঙ্গিতসহ সে আমাকে জানায় যে বুক থেকে পেট পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। প্রচুর রক্ত ক্ষয় হচ্ছিল। এ অবস্থায় আমি তাকে আমার জিপ দিয়ে নিকটবর্তী একটি মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠিয়ে দেই। সঙ্গীদের কাছ থেকে এতটুকুই জানতে পারি যে অন্ধকার থাকার দরুন আক্রমণে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ফৌজ বাম ফ্ল্যাঙ্কে থাকার কথা ছিল। কিন্তু আর্টিলারি ব্যারেজ শুরু হওয়ার পরেই অজানা কারণে ইদ্রিসের বাহিনী মধ্যস্থলে পড়ে যায়। ইদ্রিস অবিচলিত থেকে তাকে দেওয়া টার্গেট থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মধ্যস্থলের টার্গেটের দিকেই ভারতীয় বাহিনীর সাথে সাথে অগ্রসর হয়েছিল। এই অ্যাটাকটি দেখার পর আমি যেসব প্রতিনিধিদের নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থান থেকেই যুদ্ধের ব্যাখ্যা দিলাম। এরকম পরিকল্পিত আক্রমণের অভিজ্ঞতায় তারা অভিভূত হয়েছিল।

আমাদের যে সদস্য আহত হয়েছিল তার নাম মনে পড়ে না। মাস দুয়েক পর আমি একসময় হামজাপুরে নিয়মিত পরিদর্শনে যাই। হঠাৎ একটি ছিপছিপে লম্বা ছেলে সহাস্যে আমার সামনে উপস্থিত হয়ে তার শার্ট খুলতে আরম্ভ করে। বলল, এই যে স্যার আমি ফিরে এসেছি এবং আঙুল দিয়ে দেখাল যে বুক থেকে তার পেট পর্যন্ত ছয়টি গুলি লেগেছিল। আমি এখন ভালো আছি। ৬টি বুলেট লেগেছে বলে কি আমি যুদ্ধে ফিরে আসব না? আমি হতবাক হয়ে যাই এবং তাকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করেছিলাম। বিস্ময়ে, আনন্দে ও গর্বে এবং তার দেশপ্রেমের উৎকর্ষ মনোভাব দেখে আমার চোখের কয়েক ফোঁটা পানি গড়ানো বন্ধ করতে পারি নি। তার মনমানসিকতার ও দেশপ্রেমের উদাহরণ তুলে ধরলাম আমার সঙ্গীসাথীদের কাছে। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। দেশপ্রেম মানুষকে যে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করে তার একটা দৃষ্টান্ত দেখলাম।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের তাগাদা দিয়ে আসছিল যেন প্রত্যেকটি সাব-সেক্টরে প্রতিদিন কিছু না কিছু অ্যাকশন হোক। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা অনুপাতে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের সংখ্যা ছিল কম। এ ছাড়াও অস্ত্র সরবরাহের দিক থেকে আমাদের দেওয়া হচ্ছিল মার্ক থ্রি ও মার্ক ফোর রাইফেল এবং সাব-সেক্টর প্রতি একটি কি দুটি পুরোনো ব্রেনগান। এসব সদস্য অন্য সৈনিকদের হাতে চাইনিজ একে-৪৭ এবং ইন্ডিয়ানদের হাতে এসএলআর রাইফেল দেখতে পেত। মুক্তিফৌজের হাতে পুরোনো অস্ত্র থাকায় তারা মানসিকভাবে সম্ভবত নিজেদের দুর্বল মনে করত। অস্ত্রের তারতম্যের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকলে যাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকে তারাই সংঘর্ষে ভালো কাজ দেখাতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে, গেরিলাদের পুরোনো অস্ত্র নিয়ে লড়াই

করা অসম্ভব। আসলে গেরিলাদের কাজই হচ্ছে শত্রুপক্ষকে অ্যামবুশ ও ঘায়েল করে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা।

গেরিলা যুদ্ধ এবং সাধারণ যুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাত আছে। এ কথাগুলি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করতাম। মিলিটারি ইতিহাস অনুযায়ী অর্ধভুক্ত, অসুস্থ ও জীর্ণ পোশাকধারী, পুরোনো হাতিয়ার বাহক এবং স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক গেরিলার সমান হচ্ছে ১৫১ জন স্বাস্থ্যবান, সুস্থ, রেগুলেশন পোশাকে সজ্জিত এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের সৈন্য। নিজ এলাকায় অলিগলিসহ বিভিন্ন পজিশন নেওয়ার স্থান গেরিলাদের জ্ঞাত থাকে। অন্যদিকে নিয়মিত বাহিনী যাদের কাছে লড়াইয়ের স্থান অপরিচিত তারা নিজেদের অসহায় মনে করে এবং চিন্তা করে যে বোধহয় পুকুর পাড়ে, গাছের ডালে জীর্ণ কুটিরে হয়তো বা কোনো-না-কোনো গেরিলা অবস্থান নিয়ে রয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় লোকেরা থাকে গেরিলা বাহিনীর পক্ষে। অন্যদিকে গেরিলার বিপক্ষরা মনে করে যে, স্থানীয় প্রতিটি মানুষই সম্ভবত কোনো-না-কোনো প্রকারে তাদের আঘাত করতে পারবে। তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের গেরিলারা ছিল এমনই অল্প বয়স্ক এবং গরিব শ্রেণী থেকে আগত যাদের জীবনে কোনোদিন বন্দুক দেখারও সুযোগ হয় নি। অস্ত্র যে বন্ধু তা মনে না করে তারা ভয় পেত। এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণকালে এত সদুপদেশ দেওয়া হয় যে তারা ঘাবড়ে যায়। আমাদের ছেলেরা বিস্ফোরকও ব্যবহার করত কিন্তু এর ব্যবহারের জন্য শিক্ষা ও মেধার প্রয়োজন আছে। ছেলের সংখ্যা আমাদের খুব বেশি ছিল না। চেষ্টা করতাম অন্ততপক্ষে যারা একবার গেরিলা অপারেশন করে এসেছে তাদের সাথে কথার আদান-প্রদান করিয়ে দেওয়ার। এর ফলে তাদের কিছু ভয়ভীতি কমত।

আমাদের গেরিলা বাহিনীর মধ্যে একটা মনোভাব ছিল যেন প্রত্যেকে একটা করে মেশিনগান পায়। কিন্তু যুদ্ধের কায়দা অনুযায়ী এভাবে সজ্জিত বাহিনী কার্যকর হয় না। রাইফেলের কাজ রাইফেল করবে। ১০/১২টা রাইফেলের জন্য একটা মেশিনগান ও দুএকটা সাব-মেশিনগানই যথেষ্ট। এটা আমাদের সদস্যদের বুঝাতে সময় লাগত। তবু আমি বলব আমরা যে শ্রেণী থেকে আগত ছেলেদের নিয়ে কাজ করছিলাম তারা প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

অস্ত্র সরবরাহের স্বল্পতা সম্বন্ধে আমি আগেও বলেছি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে হঠাৎ করে লক্ষাধিক ফৌজকে রাতারাতি অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা সম্ভব নয়। ভারতীয়রাও পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধ এবং উত্তর অঞ্চলে চীন দেশের সাথে নিজেদের সংঘর্ষ সম্প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল। এক্ষেত্রে অবশ্যই মানতে হবে যে ভারতীয়রা প্রথমে নিজেদের ভালো নতুন অস্ত্র দেবে এবং পরিত্যক্ত অস্ত্রগুলি আমাদের ফৌজদের সরবরাহ করবে। ইচ্ছাপূর্বক তারা যে আমাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র দেয় তা আমি মনে করি না। স্বল্পতার কারণেই আমাদের তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি সরবরাহ করা হয়েছিল। তবে অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে অস্ত্র

সরবরাহের পরিমাণ বেশ বাড়তে থাকে। যার ফলে আমাদের অপারেশনগুলি দিন দিন আরো সফল হচ্ছিল।

সাত নম্বর সেক্টরে তপন নামের একটি সাব-সেক্টর ছিল, এটা আমার পরিদর্শনে আসা যাওয়ার পথে পড়ত না। তা ছাড়া অফিসার না থাকার কারণে এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব ক্যাপ্টেন রাজভির নামক এক ভারতীয় অফিসারের হাতে দেওয়া ছিল। অনেক দিন পর সেখানে যাই। ক্যাম্পটি বেশ গোছানো ছিল এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি সুপরিচালিত বলে মনে হল।

রাজভির সাথে আলোচনার পর বুঝলাম যে সে কোনোদিন আমাদের মুক্তিফৌজের সদস্যদের সীমান্ত পার হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠায় নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে সে সামরিক ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে বেশ সুন্দর মডেল তৈরি করে রেখেছিল। তার মতে পত্নীতলা পোরসারেও শত্রুসংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। এই জায়গা দুটি দখল করতে পারলে ভোলারহাটে রাহানপুর নামে গ্রামের সাথে যোগাযোগ হতে পারে এবং এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত এলাকার শামিল হতে পারে। আমি তাকে উপদেশ দিয়ে এসেছিলাম যে কেবলমাত্র সাধারণ লোকের মুখের কথা না শুনে নিজেদের ক্যাম্প থেকে 'রেকি পার্টি' পাঠানোটাই আরো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। আমার মত অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। আমি রিএনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ আরো কিছু সৈন্য সংযোগ করার পরামর্শ দেই এবং এই পরিকল্পনার সপ্তাহ দুয়েক পরে অপারেশনের পরামর্শ দেই। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার মধ্যেই হামজাপুর থেকে আমি ইদ্রিসকে তপন সাব-সেক্টরে নিয়ে আসি। কেমন করে জানি না আমার ছেলে নদিম ইদ্রিসের দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে এসে দেখি ক্যাপ্টেন রাজভি ভারি চমৎকার একটি মডেল বানিয়েছে, প্রায় ২০ ফুট × ২০ ফুট আয়তনের। তার দ্বারা আক্রমণের প্ল্যান উত্থাপন করা হয় এসব মডেলের সাহায্যে আরো নতুন তথ্য সংযুক্ত করা হয়, যা আমাদের মুক্তিফৌজের ছেলেরা সংগ্রহ করে আনে।

আমার সামনে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রুপ লিডার নিয়ে কীভাবে খঞ্জনপুর ও সাপাহার এলাকা দুটি দখল করা হবে সেই প্ল্যানটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এই প্ল্যানটির সামান্য কিছু পরিবর্তন করে আমি অনুমোদন দেই। প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের আক্রমণকারীরা ষাট জন করে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ১২০ জন সাপাহার ও খঞ্জনপুর দখল করবে। ক্যাপ্টেন রাজভি প্ল্যানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করায় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। তবে এই আলোচনা শেষ হওয়ার পর যখন প্রায় সবাই চলে যায় তখন ক্যাপ্টেন রাজভি আমাকে জানায় যে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারকে রক্ষা করার জন্য সে দুটি মেশিনগান হাতে রেখেছিল। এ ছাড়াও সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারকে গার্ড দেবার জন্য সীমান্ত এলাকায় প্যাট্রোলের ব্যবস্থা করেছিল। অধিকন্তু সে সাব-সেক্টর অধীনস্থ আবদুল খালেক নামক এক সদস্যকে গার্ড দেবার জন্য কিছু গণবাহিনী সদস্য মনোনয়ন করেছিল। এসব কথা কিন্তু আগে আলোচনা হয় নি। কী জানি এ কারণে আমার মনে

একটা খটকা লাগল। এ বিষয়টি নিয়ে ইদ্রিসের সাথে আলোচনা করলাম। ইদ্রিস কিন্তু এসব কথার বিশেষ গুরুত্ব দিল না এবং তাকে দেখে মনে হল সে ভীষণ কনফিডেন্ট। আমি তখন প্রস্থান করি। তবে তাকে সাবধান করে দেই যে সে যেন চোখকান খোলা রাখে। দুদিন পর ফজরের নামাজের আগে আমি তরঙ্গপুর থেকে তপনে আসি। শুনতে পেলাম অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। ছেলেরা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এই এলাকারই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা এগিয়ে থেকে অন্ধকার দিয়ে দুটি গ্রুপকে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার থাকতেই প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুরু হয়। আমি ধারণা করলাম যে এত সময়ে সম্ভবত সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে। পথে কেন বাধা পড়ল এটাই চিন্তা করতে থাকলাম। সূর্য যখন উঠি উঠি করছে তখন দেখি বহু আঘাতপ্রাপ্ত ছেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসছে। আরো একটু আলো হতেই ইদ্রিসকেও দেখা গেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে আসছে। এখানে এ কথাটা বলা দরকার যে সেদিন আক্রমণের সময় খালেক ও তার বডিগার্ডরা আক্রমণকারীদের সাথে ছিল না। কেন ছিল না সেটাই প্রশ্ন।

৬০ জন করে দুটি দল দুটি ভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এন্টি পারসাল মাইনে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিপক্ষদের দিক থেকে প্রচণ্ড এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু হয়; যার ফলে আমাদের ছেলেরা সীমান্ত অতিক্রমে প্রচণ্ডভাবে বাধা পায়। তারা আর অগ্রসর হতে পারে নি। এ ছাড়া লক্ষণীয় যে খালেক নামক যুবকটি এবং তার দুএকটি সঙ্গী আর ফিরে আসে নি। তারা যে নিহত হয়েছে এ কথাও কেউ বলল না। ক্যাপ্টেন রাজভিকে সাব-সেক্টর রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে অতি ক্ষুদ্র গ্রামের পাশে আহতদের দেখাশুনা করতে শুরু করি। ইদ্রিসের কথামতো দেখা গেল যে অগ্রসর হওয়ার সময় সে একটি মাইনের ওপর পা চাপা দেয় যেটি ভালো করে ফাটে নি। তাকে কেবল দুএক গজ ছিটকে দিয়েছে।

আহতদের সংখ্যা বেশি থাকার দরুন আমাদের সাথে যে পরিমাণের ফার্স্টএইড ওষুধ ও ব্যান্ডেজ ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। এই অভাব নিয়ে বেশ চেঁচামেচি হচ্ছিল এবং আমার জিপ পাঠানো হল নিকটবর্তী যে কোনো মেডিক্যাল স্টোর থেকে এসব সামগ্রী কিনবার জন্য।

আমাদের নিকটস্থ ক্ষুদ্র দুএকটি জীর্ণ কুটির থেকে দেখা যাচ্ছিল যে দশ-বার জন লোক, যাদের পরনে হাঁটুর ওপর ধুতি এবং খালি গা, কোনোরকমে শাড়ি নামক পদার্থ গায়ে ঢেকে মহিলারা আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। আমাদের ছেলেরা পানি পানি করে চিৎকার করছিল তখন দেখা গেল মধ্যবয়স্ক দাড়ি-মোচ না কামানো একজন লোক কলসি করে পানি নিয়ে এসে বলল, "বাবু এই জলটি ভালো। আমরা দূরের টিউবওয়েল থেকে এই জল টেনে নিয়ে আসি।" লোকটি নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু দেখতে পেয়েছিল। তাই সে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে। বুঝতে পারলাম সে অত্যন্ত দরিদ্র। তার দুর্বল স্বাস্থ্য ও মলিন পোশাকই তা প্রমাণ করে। এই লোকটি এসে আমাদের বলল, "বাবু এই শাড়িটি ধোপা বাড়ি থেকে ধোয়া, তুলে রেখে দেওয়া আমার স্ত্রীর শাড়ি। এটি পরিষ্কার। এটি যদি ব্যান্ডেজের কাজ দেয় তা হলে আপনারা যদি ব্যবহার করেন আমরা

সকলে খুব খুশি হব।" এই শাড়ির সঙ্গে সে একগুচ্ছ অতি জীর্ণ কলাও নিয়ে এসেছিল, যা সাধারণত বিক্রিযোগ্য নয়। বাবু এগুলো আপনারা খেতে পারেন। আমি সদ্য পেড়ে নিয়ে এসেছি। নিম্নশ্রেণীর এই হিন্দু ক্ষুদ্র পরিবারের সাহায্য প্রদানের আগ্রহে আমরা সবাই অভিভূত হই। তাদের দেওয়া পানি দিয়ে আমরা ক্ষতগুলি পরিষ্কার করতে থাকি এবং তাদের ডজনখানেক কলাও আমাদের ছেলেরা ভক্ষণ করে। জিজ্ঞাসা করলাম তাদের এই আচরণের কারণ কী। তারা বলল, "আমরা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম আহতদের কান্নাকাটি, জল ও ব্যান্ডেজের অভাব। ভাবছিলাম আপনারা কি আমাদের সাহায্য নিবেন। এই জল, শাড়ি ছাড়া তো আমাদের আর কিছু দেওয়ার নেই। আপনাদের আহতদের সংখ্যা দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনারা যে এত বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হচ্ছেন এটা দেখে বিস্মিত হচ্ছি। আমাদের হৃদয়ও কাঁদে।" তাদের সাহায্য গ্রহণে মনে হল তারাই যেন শান্তি পেয়েছে। আর আমাদের? ধন্যবাদ দেবার মতো ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিতে চাইলে তারা চেঁচিয়ে বলে, না না বাবু টাকার বিনিময়ে আমরা এগুলো দিতে আসি নি। এই দরিদ্র জীর্ণ কুটিরের বসবাসীদের প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জানাব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই ঘটনার সাথে মনে পড়ল মেজর নাজমুল হুদার মৃত্যুর কথা, যেখানে তার লাশকে সার্কিট হাউসের বাথরুমে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার সুযোগ দিতেও ভীষণভাবে আপত্তি করেছিল ও আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল।

তপন সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমাদের অপারেশন সফল হয় নি। সর্বপ্রথম কারণ আমাদের প্ল্যানটি শত্রুপক্ষ জানতে পারে। আমার ধারণা খালেকই শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছিল। সে কোনোদিন আর সাব-সেক্টরে ফিরে আসে নি। ক্যাপ্টেন রাজভির ইংরেজি বা হিন্দি ভাষা আমাদের ছেলেরা বুঝত না। তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি ছিল। ইদ্রিসের মতে তারা 'অ্যামবুশড' হয়ে গিয়েছিল এবং এরপর আমি ইদ্রিসের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যাই এবং ক্যাপ্টেন রাজভিকে ব্যর্থতার কারণ সন্ধানের নির্দেশ দিয়ে আসি।

এই প্রথমবারের মতো যে আমাদের মধ্যে পাকিস্তানি দালাল বা গোয়েন্দা কাজ করছে তা নয়। আরো কয়েক জায়গায় আমার এই সন্দেহ উদয় হয়েছিল। আমি ঐ সব ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখতে বলেছিলাম। দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে এক তুখোড় বিহারি ছেলে যে খুব ভালো বাংলা বলতে পারত তাকে আমি কোনো-না-কোনো কারণে পাকিস্তানি গোয়েন্দার হয়ে কাজ করছে বলে মনে করেছিলাম। তাকে অপারেশনের জন্য যে এলাকায় অনুপ্রবেশ করানো হয়েছিল সে অপারেশন থেকে আর ফিরে আসে নি। এমনকি ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ও দেখা যায় গুলিবিদ্ধ চোখের আশপাশে মাংস পোড়ানোর মতো দাগ। তা হলে তাকে কি নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে লুক্কায়িত কোনো এক রাজাকার হত্যা করেছিল। এ ব্যাপারটি আমি কখনো উত্থাপন করি নি। এখন লিখতে বসায় এই কথাটি মনে পড়ল। অবশ্য হতে পারে যে মাত্র কয়েক মিটার দূর থেকে তার চোখ গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। এই কথাই ঠিক।

৪

মুক্তিবাহিনীর নামকরণ কীভাবে করা হয়েছিল তার সঠিক কার্যপদ্ধতি এবং আনুষ্ঠানিকতা মনে পড়ে না। ভারতে এরা প্রথম থেকে আমাদেরকে মুক্তিফৌজ নামে ডাকত এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা এই নামটি ব্যবহার করে এসেছে। পরবর্তীকালে ভারতীয়রা আমাদের এফ এফ অর্থাৎ ফ্রিডম ফাইটার নামে ডাকত। ঋ ঋ বলতে বুঝাত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য শত্রু লাইনের পেছনে কাজ করত এবং এম এফ হিসেবে ব্যবহৃত হত পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদেরকে পরবর্তীকালে 'K' 'Z' 'I' 'S' ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

আমরা নিজেদের মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচয় দিতাম। মুক্তিবাহিনী বলতে বুঝাত সমস্ত প্রকার আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স সদস্যদের। তবে গণবাহিনী বলতে বুঝাত যারা রেগুলার ট্রুপস-এর সদস্য ছিল না। পাকিস্তানিরা সর্বপ্রথম আমাদের বিদ্রোহী বাহিনী নাম দিয়েছিল। এটা ছিল তাদের ইচ্ছাকৃত। আমরা কেবল পাকিস্তানবিরোধী ছিলাম না, দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যেই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য। শত্রুপক্ষ আমাদের ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীকে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আকস্মিকভাবে অস্ত্রসমর্পণের আয়োজন করেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে হতাহত করে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। তবে একাত্তরের মার্চ মাসের দিকে আকাশে-বাতাসে রাজনীতির প্রবাহ বইছিল। তুলনামূলকভাবে অফিসারবৃন্দ শান্তিতে থাকলেও সাধারণ সেনাদের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। আর্মিতে একটা কথা আছে 'লংগর গপ' অর্থাৎ রন্ধনশালার আশপাশের কথাবার্তা এবং এই গপ যে সত্য জোয়ানরা আগে থেকেই কেমন করে জানি আঁচ করতে পারত। বাংলাদেশী সৈন্যদের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহ হয়েছিল। যেমন চট্টগ্রামে রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে, কুমিল্লায় খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এবং পরিকল্পিতভাবে গাজীপুরে সফিউল্লাহর নেতৃত্বে।

হানাদার বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল ব্যাটালিয়নে কোম্পানিদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানে রাখতে যাতে তারা পরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহ করতে না পারে। বাঙালি সৈন্যরা যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত ছিল তাদের হত্যা করতে হানাদার বাহিনীর বেগ পেতে হয় নি। তবুও এদের অনেকেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে হানাদার বাহিনীর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। এইসব ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ২৫ মার্চ রাত্রের ভয়াবহ আক্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। তবে তারা ধরে নিয়েছিল যে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে বাঙালি সৈন্যরা আত্মরক্ষার্থে হানাদার বাহিনী থেকে পালিয়ে আসে। এসব ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাস্তব খবরাদি, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠী বা দল নিহত হওয়ার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে কোথায় অবস্থান করছে এবং কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে

তা জানার উপায় ছিল না। তবে এদের মধ্যে বেশিরভাগ দল ও গোষ্ঠী সীমান্ত অভিমুখে রওয়ানা হয়। এরা প্রথমে বাঙালি জনগণের কাছে খবরাদি পেয়ে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

নিজ নিজ ইউনিট বা সাব ইউনিট থেকে বেরিয়ে এসে এরা দেখতে পায় বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থা। ঘরবাড়ি জ্বলছে, মানুষ রাস্তায় মরে পড়ে আছে এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিহারি সম্প্রদায় উল্লাস করছে। এই প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো-না-কোনো দল প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এইসব কার্যকলাপ অস্বাভাবিক ছিল না। প্রতিহিংসা জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তবু এরা সবাই সীমান্তমুখে অভিযান শুরু করায় পথিমধ্যে অনেক দল একত্রিত হতে পেরেছিল।

ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করার সংবাদ পুলিশরা আন্দাজ করতে পেরে অস্ত্র জমা দেয়। ২৫ মার্চের রাত্রে হানাদার বাহিনী কর্তৃক সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার রাজারবাগে। বাঙালি সদস্যরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করার চেষ্টা করাতে শেষ অবধি হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্কও ব্যবহার করেছিল।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তৎকালীন ইপিআর বাহিনী তাদের কার্যাবলির নিয়ম অনুযায়ী সারা বাংলাদেশের সীমান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আর এই বাহিনীদের কাছে ছিল তৎকালীন উন্নত ধরনের ওয়ারলেস বিভাগ। এই যন্ত্রের সাহায্যে তারা তাদের মধ্যে কিছুটা সংযোগ বজায় রেখেছিল যার ফলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশের সমস্ত এলাকার খবর বিনিময় করছিল। ওয়ারলেস অপারেটররা বেশিরভাগ ছিল বাঙালি। শরণার্থীদের কাছ থেকে খবরাদি নিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি একে অন্যদের পৌঁছে দিত। ২ ও ৩ এপ্রিল '৭১ সালে আমি সিলেটের চা বাগানে অবস্থিত ইপিআর ওয়ারলেস অপারেটরের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম দিনাজপুর এলাকার পরিস্থিতি। একে একে এই অপারেটরদের পশ্চাদপসরণ ও স্থানান্তরের কারণে দেশের খবরাদিও আর তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না।

পাক হানাদার বাহিনীর ২৫ রাত্রির স্ট্রাটেজি তেমন নিশ্চিত ছিল না। আমার মতে এটাকে বলা যায় 'ঝি পিটিয়ে বউকে শেখানো'। হানাদার বাহিনী ইচ্ছা করলে ২৫ রাত্রে বাঙালি এমএনএ ও এমপিদের হত্যা করতে পারত। ঢাকাস্থ শেখ মুজিবুর রহমানের হেডকোয়ার্টার থেকে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করতে পারত। কিন্তু তা না করে তারা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। এ ছাড়াও তারা গরিব অসহায় বস্তিবাসী, বন্দরে অবস্থিত কুলি সম্প্রদায়, বাজারে বাজারে ঘুমন্ত কর্মচারী এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় প্রলয়ঙ্করী আঘাত হেনেছিল এবং অগ্নিসংযোগ করেছিল। হানাদার বাহিনীর জেনারেলরা মনে করেছিল যে দুএকদিন এরকম আক্রমণ চালিয়ে এমন এক আতঙ্ক সৃষ্টি করবে যে, বাঙালি সিপাহিরা বোধহয় বিদ্রোহ করতে ভয় পাবে এবং তাদের অধীনে কর্মরত থাকবে। এটা ছিল নির্বোধের পরিকল্পনা। ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না।

একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে। তরঙ্গপুরে আমার তাঁবুতে এসে এক ইপিআর সিপাহি বর্ণনা করে সে এবং তার কয়েক জন সঙ্গী কীভাবে পালিয়ে আসে। এই দলটি পথিমধ্যে যত বিহারিকে দেখতে পায় হত্যা করেছিল এবং তাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এই সিপাহিটি মনে করেছিল আমার কাছ থেকে অনেক বাহবা পাবে। আমি নিশ্চুপ থাকি এবং হেডকোয়ার্টারের সুবেদারকে নির্দেশ দেই যে, এই সিপাহিটি এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে যেন কোনোদিন অপারেশনে যেতে দেওয়া না হয়। যারা একবার খুনখারাবি কার্যক্রম করে এসেছে তারা আবারো দেশের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে। নিরীহ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা কোনো সিপাহির কাজ নয়।

যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু অলঙ্ঘনীয় বিধি আছে। এই নীতিমালা মেনে চলে আসা হচ্ছে আজ কয়েক শত বছর ধরে। তবে এইসব নীতিমালা তখন পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ছিল না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই জ্ঞান অর্জন করা হয়। এখন এগুলো বিশেষভাবে চর্চা করা হয়। এক বিধি ক্ষীণ বা দুর্বল হলে অন্য বিধির সবলতা দিয়ে কিছুটা সামাল দেওয়া যেতে পারে। এগুলোর নামই ট্যাকটিক্স ও স্ট্রাটেজিক চর্চা। একটা বিশেষ বিধি যেমন রণক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের বিঘ্ন ঘটলে যুদ্ধ পরিচালনা দুরূহ হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীর কোনো সংযোগই ছিল না। সেক্টরের সাথে সাব-সেক্টরের সংযোগ ছিল সংবাদবাহকের মাধ্যমে। এক সেক্টরের সাথে আরেক সেক্টরের কোনো সংযোগ ছিল না। মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের একবার অপারেশনে নামিয়ে দিয়ে তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের কোনো সংবাদই পাওয়া যেত না। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সিগন্যাল কোরের সাহায্যে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করত। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম এই বেতার সংযোগের মাধ্যমে জেনারেল ওসমানীর হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে। আমার প্রেরিত সংবাদ ভারত কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হলেই সেটা পাঠানো হত। তরঙ্গপুরে থাকতে আমি ওসমানীর সাথে সিভিল টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা করলেও কৃতকার্য হতে পারি নি। প্রথমত, লাইন পাওয়াই যেত না এবং দ্বিতীয়ত, লাইন পেলেও আমাদের আলাপ শ্রবণদুষ্ট ছিল। যাতে কোনো কাজই হত না। সম্ভবত অক্টোবরের শেষের দিকে সাত নম্বর সেক্টরকে ব্যাটারি চালিত কয়েকটি বেতার যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল যার মাধ্যমে সাব-সেক্টরের বাহিনী পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। যন্ত্রগুলি প্রায় খেলনার মতোই ছিল। খুব ভালো কাজ করত না।

সম্ভবত জুলাই মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর অপারেশন আরো তৎপর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল বলে জানা যায়। বাংলাদেশ সেনাপ্রধান অফিস থেকে এ সংক্রান্ত সম্ভবত কেবল একটি চিঠি পেয়েছিলাম। অন্যদিকে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাদের অপারেশন করার জন্য তাদের চাপ অব্যাহত রেখেছিল। এর উত্তরে আমরা কয়েকটি বাধার কথা উল্লেখ করতাম। যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলার সংখ্যা বৃদ্ধি, আর্মির নিয়মানুযায়ী সদস্যদের অস্ত্র সরবরাহ করা এবং ওয়ারলেস সেট দেওয়ার জন্য।

নবাবগঞ্জে ছিল পাকিস্তানি ইপিআর-এর বেশ বড় একটি ঘাঁটি, মহানদীর পাড়ে। একসময় এটি আক্রমণের জন্য আমি মোহেদীপুরে সাব-সেক্টরের ওপর চাপ দিচ্ছিলাম। তবে সীমিত সংখ্যক বাহিনীর কারণে হামজাপুর থেকে ইদ্রিসকে আনতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে পদ্মা নদীর চরাঞ্চল থেকে গিয়াস উদ্দিনের বাহিনীকেও সংযুক্ত করেছিলাম। সোনা মসজিদ থেকে নবাবগঞ্জ যেতে হলে শিবগঞ্জ থানা অতিক্রম করতে হয়। এই থানা শত্রুপক্ষ কীভাবে কত সংখ্যক বাহিনী দিয়ে দখলে রেখেছিল তা জানবার জন্য শিবগঞ্জ থানায় অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা নেই। ইদ্রিসের সদস্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেই এবং ক্যাপ্টেন গিয়াসকে বিপরীত দিক থেকে জলপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে শিবগঞ্জ থানা আক্রমণ করতে বলি। আমাদের এই অ্যাকশন সফল হয় নি। তারা যথেষ্ট পরিমাণ শত্রুসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি। প্ল্যান অনুযায়ী কথা ছিল যে ইদ্রিস থানাটির ওপর রকেট লঞ্চার নিক্ষেপ করবে এবং এর বিপরীত দিকে ক্যাপ্টেন গিয়াস পলায়নরত শত্রুসেনার ওপর হামলা চালাবে। ইদ্রিসের মতানুযায়ী সে তার টার্গেটে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল এবং রকেট নিক্ষেপও করেছিল। পরে জানতে পারা যায় যে ক্যাপ্টেন গিয়াস বিপরীত দিক থেকে জলপথে শিবগঞ্জ থানার নিকটস্থ স্থানে সময়মতো অবতীর্ণ হতে পারে নি। প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেল। ইদ্রিসের রিপোর্ট অনুযায়ী শিবগঞ্জ থানাকে নাকি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ মাস দুয়েক পরে ডিসেম্বর মাসে যখন শিবগঞ্জ থানা দখলে এনে মহানদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি তখন দেখতে পাওয়া যায় যে শিবগঞ্জ থানাটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। অর্থাৎ আমাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছিল।

গেরিলা সদস্যদের ১০, ১২ বা ১৫ জন গেরিলা নিয়ে টিম তৈরি করতাম। একজন লিডার এবং ডেপুটি লিডারও নিযুক্ত করা হত। এসব দল ১০/১৫ দিন পরে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে নানা রকম কৃতিত্বের সংবাদ দিত। গেরিলাদের বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হত যে তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য যেন বিন্দুমাত্র কোনো চাপ স্থানীয় বাড়ির ওপর না দেয়। চিঁড়া গুড় খেয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হত। গৃহকর্তা এবং পরিবারকে সম্মান প্রদর্শন করার হুকুম দেওয়া ছিল, সেই গৃহকর্তা যতই গরিব হোক না কেন। কর্তার সম্মতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ না করারও নির্দেশ ছিল, ঘাঁটিটি ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা ছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী দিবালোকে কোনো অপারেশন না করার নির্দেশ দেওয়া থাকত। অপারেশনটি যেন বাড়িসংলগ্ন স্থানে না করা হয় সেই আদেশও ছিল। হানাদার বাহিনী তাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশের কারণে গ্রামবাসীদের নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ করত। মোটামুটি কথায় অপারেশন এলাকায় গেরিলারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে ও তাদের পরিচয় যেন অন্যত্র পৌঁছে না দেওয়া হয়।

'৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার নিজস্ব এক ব্যর্থতা আমাকে বিষণ্ন ও ক্ষুব্ধ করেছিল, যা আজো প্রত্যহ মনে পড়ে। আর্মিতে থাকাকালে মিলিটারি ইতিহাস পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সব থিয়েটারের ইতিহাস

কিছু না কিছু পড়েছিলাম। ইতিহাসের একাধিক উদাহরণ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে এক বাহিনীর মধ্যে পরস্পর অংশের সঙ্গে কিছু গুলিবিনিময় আকস্মিকভাবে হয়ে যায়। পেট্রোলিঙের সদস্যদের ওপর ভুলক্রমে গুলি ছুড়ে দেওয়া হয়। বিমান বাহিনী নিজ ট্রুপসদের অবস্থানকে শত্রু অবস্থান চিহ্নিত করে গোলাবর্ষণ করে। সমুদ্র থেকে নৌবহরের গোলাবর্ষণও অনেক সময় নিজ বাহিনীর ওপর গিয়ে পড়ে। আর্টিলারির গোলাও তেমনি নিজ বাহিনীর ওপর একাধিক বার বর্ষিত হয়ে এসেছে। এই বিষয় সংক্রান্ত ট্রেনিঙের সময় অফিসারদের বিশেষভাবে আত্মঘাতী সংঘর্ষ এড়াবার জন্য জোর দেওয়া হত। এতকিছু জানা সত্ত্বেও '৭১-এর যুদ্ধে নিজেই দোষী হয়ে পড়েছিলাম।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে আমার একটি বিশেষ কোয়ালিফিকেশন ছিল। আমি ছিলাম তোপখানার সদস্য। আমাদের কাজ ছিল ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করে গোলন্দাজ বাহিনীকে এমনি নির্দেশ দেওয়া যাতে কোনো প্রকারে নিজ বাহিনীর ওপর আত্মঘাতী গোলাবর্ষণ না হয়। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তোপখানার অফিসারদের অগ্রসররত নিজ বাহিনীর পাশাপাশি থাকতে হত, শত্রুর পজিশনটা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় এবং আমার সঙ্গে ওয়ারেলসসহ ভারতীয় দুই সিগন্যাল বাহিনীর লোককে নিয়োগ করে দেয়। তবে এটা ছিল একটা শর্তসাপেক্ষে। আমি যেন এই দুব্যক্তিকে সরাসরি ফ্রন্টে না নিয়ে যাই। আবার অন্যদিকে আমাদের নিজস্ব লোকেরা আক্রমণ করার জন্য যখন এগিয়ে যেত তাদের কাছে কোনো ওয়ারলেস ইকুইপমেন্ট ছিল না। সুতরাং গাছপালা ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মিত্রশক্তি কতটা এগিয়ে গিয়েছে তা আমার জানবার কোনো উপায় ছিল না।

একবার শিবগঞ্জ অভিমুখে অপারেশন চলাকালে আমার বাহিনীর এক অংশ শত্রুর মোকাবিলার জন্য আটকে যায়। কিন্তু বাকি সকলে শৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই এগিয়ে যাবার খবরটা আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয় নি এবং আটকেপড়া লোকগুলো তাদের অবস্থান সংবাদ দিয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে আমার দ্বারা গোলাবর্ষণ করতে গিয়ে মাউন্টেন আর্টিলারির কয়েকটি গোলা নিজ বাহিনীর ওপর পড়ার ফলে কয়েকজন নিহত হয় এবং বেশ কজন আহত হয়। এই অবস্থাতে তারা দ্রুত ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে খবর পাঠায় আর্টিলারি থামিয়ে দেবার জন্য। এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে সেখানে আমার ১৬ বছর বয়স্ক সন্তানও ছিল। সুতরাং অতি সাবধানতার সাথে গোলাবর্ষণ করার চেষ্টা করলেও ঘটনাচক্রে তোপখানার শেল নিজ বাহিনীর মধ্যে বর্ষিত হয়। আমি যতই বাহানা দেই না কেন, বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা বলি না কেন, সেদিনের এই প্রচণ্ড ভুল আজো আমাকে পীড়া দেয়।

২০তম মাউন্টেন ডিভিশনের সাথে কাজ করতে আমার ভালোই লাগত। এই ডিভিশনের সকল স্তরের অফিসার মুক্তিবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিশেষ করে

ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল লাছমান সিং লেহাল যিনি তোপখানার লোক ছিলেন। সহানুভূতিশীল যতই থাকুক না কেন এরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলি অক্ষরে অক্ষরে মানত। ব্রিগেডের ৩.৭ ইঞ্চি মাউন্টেন তোপগুলি আমাকে ব্যবহার করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে অনেক সময় আমাদের বাহিনী তোপখানার রেঞ্জের বাইরে চলে যেত। তাদের সাহায্যার্থে যখন আমি তোপখানার ব্যাটারিগুলো বাংলাদেশের সীমান্তে নিরাপদ বা কিছু অভ্যন্তরে গিয়ে 'ডিপ্লয়' করার পরামর্শ দিতাম তারা কখনো গ্রহণ করত না। সুতরাং আমাদের সীমান্তের অ্যাকশনগুলো মাউন্টেন আর্টিলারির রেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

একবার আমি তোপখানার কমান্ডারকে রাজি করিয়েছিলাম যে পদ্মার চরে 'ডিপ্লয়' করিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর গোলাবর্ষণ করতে। কারণ এখানে ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের বৃহত্তর ঘাঁটি। কেমন করে জানি না আওয়ামী লীগের নেতা তৎকালীন মন্ত্রী কামরুজ্জামান এ কথা জানতে পারেন। একদিন তিনি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তরঙ্গপুরে আমার হেডকোয়ার্টারে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন আমি সত্যি সত্যি রাজশাহী শহরের ওপর গোলাবর্ষণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি কি না। তাকে বলেছিলাম যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে গোলাবর্ষণ করা হবে। তিনি আমার থেকে গ্যারান্টি চেয়েছিলেন যে একটি শেলও যেন শহরবাসীর ওপর না পড়ে। এই গ্যারান্টি দিতে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করি এবং বলি যে সর্ব প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হবে যেন একটি শেলও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে না পড়ে। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। আমার মনে হচ্ছিল যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও গোলাবর্ষণ সমর্থন করেন নি। এখন মনে হয় যে সেই সময়ে পাকিস্তানের সাথে আপস করার লক্ষ্যে চক্রান্ত চলছিল। তবে তিনি এই চক্রান্তে জড়িত ছিলেন বলে আমার কখনো মনে হয় নি। তিনি নিজে ছিলেন রাজশাহীবাসী। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তিনি রাজশাহীতে গোলাবর্ষণ না করতে অনুরোধ করে যান। এই অনুরোধ রাখা হয়েছিল।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজশাহীর শাহপুর গড়ে শত্রুপক্ষের সাথে একটি সংঘর্ষ হয়ে যায়। এখানেও আমাকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আকাশ ফর্সা হয়ে যাবার পরপরই ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন ও লে. রফিক প্রমুখের নেতৃত্বে এই অ্যাকশন সংঘটিত হয়। অগ্রসর পথে ছোট একটি নালা ছিল। তবে এটি গভীরও ছিল। আমার ছেলে নদিম সাঁতার জানত না। তাকে লুঙ্গিটা ব্যবহার করে কীভাবে বাতাস ভরে ভাসতে পারা যায় শিখিয়ে দেওয়া হয়। তবে তাকে এই পন্থা অবলম্বন করতে হয় নি। কারণ অন্য সদস্যরা টেনে খাল পার করিয়ে দেয়। এই অ্যাকশন বাহিনীকে দু ভাগে বিভক্ত করে অগ্রসরের পরিকল্পনা দেওয়া হয়। ডান দিকের বাহিনীর শত্রুপক্ষের অবস্থান দখল করে নেয় প্রথমে। বাম দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ বহুক্ষণ ধরে চলতে থাকে। সে কারণে আমি সে অঞ্চলে চলে যাই এবং তোপখানাকে ব্যবহার করে তাদের অগ্রসরমান পথ সহজ করে দেই। এই বাম দিকের

অবস্থানের ছোটখাটো দুএকটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। প্রথমত, শত্রুপক্ষ পিছু হটে গেলে কিছু রাজাকার আশপাশের বাড়িতে অবস্থান নেয়। আমাদের ছেলেরা তাদের খুঁজে বের করে গুলি করে মারতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় আমি সেখানে পৌঁছাই এবং অত্যন্ত বিরক্ত হই আমার আদেশ অমান্য করার জন্য। শত্রুপক্ষের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের মারা উচিত নয়, উচিত বন্দি করা। দ্বিতীয় দৃশ্যটি হচ্ছে লোকজনশূন্য ছোট্ট একটি গ্রামে। তারা সঙ্গে করে গবাদিপশু সব নিয়ে গেছে। তবে ছোট একটি বাছুর কেন জানি না জাহাঙ্গীরের পিছন পিছন ঘুরছিল এবং তার হাত চাটছিল। জাহাঙ্গীর এতে বিরক্ত হয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাছুরটির মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হয়। আমি বাধা দেই। তাকে বলি, গ্রামে তো কোনো লোক নেই। এই বাছুরটি লালনপালনের দায়িত্ব তোমারই। জাহাঙ্গীর রসিকতা অত ভালবাসত না। তবে আমার কথা রেখে বাছুরটিকে তার পেছন পেছন আসতে দেয়।

এই অ্যাকশন শেষ হওয়ার পরে লে. রফিককে আমি পুরো অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে প্রস্তুত হই। আমাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে এক সদস্য বলল যে এই পুরো অ্যাকশনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কৃতিত্ব রয়েছে। তাদের গোলাবর্ষণের কারণে শত্রুপক্ষ পিছু হটে যায় এবং গ্রামবাসী নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার আশায় গ্রাম ত্যাগ করে। এ সময় কে একজন বলে উঠল যে এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই পাকিস্তানিদের সমর্থক ও রাজাকার।

আজ দীর্ঘ ৩০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর '৭১-এর রণাঙ্গনের অসংখ্য ঘটনাগুলির বিশদভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। জায়গাগুলির নাম মনে পড়ে না। গ্রুপ লিডার বা সাব-সেক্টর কমান্ডারের নাম মনে আসে না। এককভাবে যারা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তাদের আবছা চেহারা ক্ষণিকের জন্য মানসপটে ফুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব অপারেশনের মধ্যে আমি সামান্য কিছু ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শী।

সেক্টরের অপারেশনগুলো দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সাব-সেক্টরে অবস্থানরত ক্যাম্প থেকে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের পিছু হটিয়ে দেবার চেষ্টা করা। এটার লক্ষ্য ছিল মুক্ত এলাকার ক্রমশ সম্প্রসারণ করা। এইসব অপারেশনে সব সময় সাফল্য না আসলেও শত্রুপক্ষ অনুমান করত যে সম্ভবত ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের পিছনে থেকে সাহায্য দিয়ে ভারতীয় আগ্রাসন বজায় রেখেছে। এই আগ্রাসনকে ঠেকাবার জন্য হানাদার বাহিনীকে ইপিআর সদস্য ও কিছু সংখ্যক নিয়মিত বাহিনীকে সীমান্তের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে হত। তাদের পক্ষে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়মিত রিজার্ভ সৈন্য আনা সম্ভব ছিল না। তাদের সীমিত সংখ্যক বাহিনীকে আমাদের ৯টি সেক্টরের মোকাবিলা করতে হত। ফলে প্রতিটি অঞ্চল দুর্বল হয়ে পড়ে। আমাদের গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে শত্রুদের "এল অফ সি" অর্থাৎ যোগাযোগের সড়ক বিপর্যস্ত করত। যার ফলে তাদের পক্ষে সীমান্ত বাহিনীকে যথাযথভাবে সাহায্য প্রদান করা ক্রমান্বয়ে অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য।

পরবর্তীকালে শুনতে পাওয়া যায় যে, হানাদার বাহিনী তাদের নিয়মিত বাহিনীকে সীমান্তের সর্বত্র ছিটিয়ে রেখে দেশের অভ্যন্তরে তারা দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উপলব্ধি করে। সুতরাং তারা দেশের অভ্যন্তরে বড় বড় টাউনগুলোতে শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়। সীমান্ত থেকে অপসারিত সৈন্যদের স্থান-পূরণের জন্য রাজাকার বাহিনী ও পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা হত। এই নীতি আমাদের পক্ষেই গিয়েছিল।

সেক্টরের সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের ছোটখাটো অপারেশন করতে গিয়ে তারা অভিজ্ঞতা লাভ করছিল এবং এই অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে ক্রমশ নতুন নতুন গ্রুপ লিডারও দলের ভিতরে গড়ে উঠছিল। এ ছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছিল। অস্ত্র সম্ভারের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশি আসতে শুরু করেছিল। ফলে আমরা সাফল্য লাভ করতে শুরু করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে এসব বিষয়ের ওপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর রেখেছিল। তারা কোনোদিনই চায় নি যে মুক্তিফৌজের অনিয়মিত বাহিনী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবং পেশাগতভাবে দক্ষতা অর্জন করুক যারা কিনা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাব-সেক্টরসমূহের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করার সময়ই পেতাম না। সেক্টর সদস্যরা দীর্ঘকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল যা কিনা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাম্য ছিল না। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ওপর ভারতীয়দের কর্তৃত্ব রাখার সিদ্ধান্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। এটাও মনে রাখতে হবে যে মুক্তিবাহিনীর ওপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রভাব পড়ে। মুক্তিবাহিনীকে এজন্য দোষারোপ করা যায় না। কারণ এই নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে বিশেষ সংযোগ রাখতেন না। তবে কেবল তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারের সাথে এমপি হায়দার আলী ও আবু সাঈদ প্রমুখের আসা-যাওয়া ছিল। রাহানপুরের এমপি খালেদ মিয়া এবং রাজশাহী শিবগঞ্জ এলাকার এমপি ডা. মন্টু সাব-সেক্টরের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত ছিলেন।

একাধিক এমপিকে সাব-সেক্টরে অবস্থান নেওয়ার প্রস্তাব দিলেও তা তারা গ্রহণ করতে পারেন নি। বলতে শোনা গিয়েছিল যে তাদের জীবন নাকি অনেক মূল্যবান। সাব-সেক্টরে গিয়ে তারা তাদের জীবন বিপন্ন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই অনুপস্থিতির কারণে আওয়ামী লীগের রাজনীতি মুক্তিবাহিনী সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্যদিকে সাব-সেক্টরের কমান্ডারদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীতে নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে উঠতে শুরু করে যা আওয়ামী লীগের অনুকূলে ছিল না। ভারতের ইন্টেলিজেন্স বিভাগ এটা আঁচ করতে পেরেছিল।

উপরোক্ত কারণেই মুক্তিবাহিনীকে ভারী অস্ত্রাদি সরবরাহ করা হত না। স্বাধীনতা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত না করার কৌশলও ভারতকে অবলম্বন করতে হয়। মুক্তিবাহিনীকে

কন্ট্রোলে রাখা ছাড়াও বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কালক্ষেপণ না করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপও জরুরি হয়ে পড়ে। সাত নম্বর সেক্টরের সাথে জড়িত বিশ মাউন্টেন ডিভিশনের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থান নিচ্ছিল। এই বাহিনীকে কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় এ সংক্রান্ত শিলিগুড়ি ২য় কোর হেডকোয়ার্টারে একটি মিটিং ডাকা হয়। এখানে আমি উপস্থিত ছিলাম।

এই মিটিঙে স্টাফ অফিসাররা বর্ণনা করেন যে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় এবং আমার অজান্তে যেখানেই পাকিস্তান রেগুলার ট্রুপসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, তারা সেখানে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বিশেষ করে হিলি সেক্টরে। আমি মন্তব্য করেছিলাম যে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাই ভ্রান্ত পরিকল্পনা। পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আমাদের সাব-সেক্টরে অবস্থানরত সদস্যদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাশ কাটিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর পেছনে অবস্থান নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক এবং ভারতীয় সৈন্যরা পেছন থেকে সহায়তা করুক। আমাদের সদস্যদের পক্ষে গ্রামবাসীদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তান ঘাঁটির পেছনে অবস্থান নেওয়াটা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ছিল। কারণ গ্রামবাসী পাকিস্তানিদের চলাচল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানত, স্থানীয় লোকেরা এসব ছেলেদের নিরাপদ পথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করত।

হিলিতে পাকিস্তান ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পরিকল্পনা আমার কাছে প্রকাশ করা হয় নি। আমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না। পরে শুনতে পেয়েছিলাম যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করার পরও ভারতীয়রা পাকিস্তানি রেগুলার বাহিনীকে তাদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দিতে পারে নি। এখানে ভারতীয়রা প্রচণ্ড মার খায়। এতে বহু সৈন্য হতাহত হয়। এমনকি গার্ড রেজিমেন্টের কর্নেল ও অ্যাডজুটেন্ট এই সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন। পরবর্তীকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের কৌশলাদি পরিবর্তন করে।

তপন, ঠাকুরবাড়ী ও আঙিনাবাদ সাব-সেক্টরসমূহে আমার প্রত্যক্ষ কমান্ড ছিল শিথিল দূরত্বের কারণে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদাররাই এগুলি দেখাশুনা করত। একজনেরই নাম মনে পড়ে— সুবেদার মোয়াজ্জেম। এখানে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় মেজরের ওপর। এই তিনটির কোনো একটি সাব-সেক্টরে পরিদর্শনে যাই। নভেম্বর মাসের শেষ পর্যায়ে সাব-সেক্টরের অবস্থানে গিয়ে দেখি ভারতীয় মেজর অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। হিলির উত্তরে ফুলবাড়িয়া অঞ্চলে এই খবর পেয়ে আমি জিপ নিয়ে যানবাহী একটি রাস্তা দিয়ে একাই পাড়ি দিলাম। সবাই নীরব নিস্তব্ধ। বেশ কয়েক মাইল পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েও আমাদের সদস্যদের কোনো হদিস পেলাম না। পথিমধ্যে এলাকার দুএকজন পথিক খবর দিল যে আমাদের বাহিনী তার আগের দিনই এগিয়ে গিয়েছে। তাই আবার জিপ হাঁকাতে শুরু করলাম। হঠাৎ এক বাঁকে গিয়ে দেখলাম পাকিস্তানি জেনারেলের একটি জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তার আশপাশে আমাদের বাহিনীর ৪-৫ জন সদস্য পাহারা দিচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

ভারতীয় মেজরের কমান্ডে এবং আমাদের বাহিনীর তারেক নামক এক যুবকের নেতৃত্বে ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে এই স্থান হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে শত্রুপক্ষের একটি জিপসহ আরো কয়েকটি মিলিটারি ট্রাককে এই পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তারা সড়কের দুপাশে অবস্থান নেয়। শত্রুপক্ষ আমাদের ছেলেদের দেখতে না পাওয়ার কারণে তারা সীমান্তের দিকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাইফেল রেঞ্জে চলে আসামাত্র গুলিবর্ষণ শুরু হয়। পাকিস্তানি জেনারেলের জিপ উল্টোমুখী করে পালাবার সুযোগ পায় নি। ছেলেদের বর্ণনানুযায়ী জিপের আরোহী, তার লাল টুপি, স্কন্ধের মিলিটারি ব্যাজ ছুড়ে ফেলতে দেখা যায়। একসময় এই আরোহী তার হাতের ম্যাপ কেসটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং অন্যান্য যানবাহনগুলিও উল্টো পথ ধরে। এসব ছেলেদের নাকি তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জিপটিকে পরীক্ষা করে দেখি এটা সত্যি সত্যি একজন জেনারেলের জিপ। জিপের প্লেটে দুটো লাল তারকাও ছিল। টুপিতে জেনারেলের লাল ব্যাজও ছিল। পরীক্ষা করে কোনো সন্দেহ রইল না যে এটা একজন জেনারেলের। ম্যাপ কেসটি পরীক্ষা করে দেখলাম আমাদের পক্ষের কিছু অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এরকম অ্যামবুশ আমার সেক্টরে আর কখনো ঘটে নি। আমি নিজে যে কত উল্লসিত হয়েছিলাম বলা যায় না। ছেলেদের অভিনন্দন জানালাম এবং পাহারারত অবস্থায় থাকতে বললাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত। এই জিপটি ও তার মালামাল আমি ফিরবার পথে তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার কথা জানালাম।

যে ছেলেটির নেতৃত্বে এই অ্যামবুশ করা হয়েছিল পরে জানতে পারি তার পুরো নাম ছিল এ টি এম হামিদুল হোসেন তারেক। এই সাব-সেক্টরে ছেলেটির সঙ্গে পূর্বে দুএকবার দেখা হয়েছিল। সাব-সেক্টরের পুরো অবস্থান ও কার্যক্রম ছেলেটির নখাগ্রে ছিল। বুঝতে দেরি হয় নি যে ভারতীয় মেজর আমাদের তারেকের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, অর্থাৎ বলতে গেলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে তারেক অপারেশনের জন্য দায়িত্ব বহন করছিল।

তারেক পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে এবং লে. কর্নেল হিসেবে তার পদোন্নতিও হয়। দক্ষতার কারণে তাকে স্টাফ কলেজে কোর্স করবার জন্য পাকিস্তানে অবস্থিত স্টাফ কলেজ কোয়েটাতে প্রেরণ করা হয়েছিল। নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী হওয়ার দরুন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে সহ্য করতে না পেরে তার নামে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে কলেজ থেকে অপসারণ করে। পরবর্তীকালে তারেকের কাছ থেকে শুনতে পাই যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাকিস্তান কর্তৃক অপবাদটি তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান এই অপমান সহ্য করতে না পেরে চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়।

অ্যামবুশের কথায় ফিরে আসি। ফিরতি পথে আমি জিপটিকে অ্যামবুশের স্থানে দেখতে পাই নি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এটিকে দ্রুত কবজা

করে স্থানান্তরিত করে। জেনারেলের ম্যাপ কেসটি কেবল আমার হাতে থেকে গিয়েছিল, যেটি আমি পরে প্রেম সিঙের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই ঘটনাটি এখানে বর্ণনা করে আমি আদৌ খুশি হতে পারছি না। এর সম্পূর্ণ বিবরণ তারেক কর্তৃক লেখা উচিত। জানতে পারলাম সে লিখেছে।

যে জেনারেলকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল নজর হোসেন, ১৯৫৬–৫৭ সালে তিনি চৌদ্দ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ঢাকাতে অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাকে মোটামুটি ভালোই চিনতাম। তবে তার মধ্যে যে জেনারেল হওয়ার ক্ষমতা আছে সে ধারণা আমার জন্মায় নি। তিনি একজন সাধারণ পাকিস্তানি পদাতিক সৈনিক থেকে কমিশন পেয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। সাত নম্বর সেক্টরের গেরিলা সদস্যদের সাহসিকতার পরিচয় এবং বীরত্ব প্রদর্শন সংক্রান্ত অ্যাকশনের কাহিনীর সঠিক তথ্য ও বিবরণ আমার স্মৃতি থেকে অনেকটা মুছে গিয়েছে। গেরিলা ট্রুপসের কেউ কেউ তাদের দলীয় কাহিনী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশও করেছে। বগুড়ার এক সদস্য মোখলেসুর রহমান দুলু সম্প্রতি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। এই লেখাটি এখানে সংযোজন করা দরকার। দুলু কোনো বই প্রকাশ করছে না। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বলে শেষ করা যাবে না। আর সব ঘটনা বলবও না। তবে একটি ঘটনা বলব। যে অপারেশন করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্রয়োজনে আত্মহত্যা করব। ২ অক্টোবর ১৯৭১–এর এক ঘটনা। দেশে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমি ৭ সেক্টরের অধীনে একটি কোম্পানির কমান্ডার। কর্নেল নুরুজ্জামান আমাদের সেক্টর কমান্ডার। তিনি আমাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন একের পর এক অপারেশন চালাতে হবে। সামনে আমাদের শুভদিন আসছে। অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। আমিও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিলাম। এর আগে যখন সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল তিনি আমার সবকিছু জানতে চাইলেন। আমি ভারত থেকে কমান্ডো প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এ বিষয়ে তিনি অবগত হলেন। এর আগে হিলি সীমান্তে সামনাসামনি যুদ্ধে আমার পারদর্শিতা সম্পর্কেও জানলেন। বয়সে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল। ২ অক্টোবর খবর পেলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ট্রেন সুকানপুকুর এলাকায় এসেছে। ট্রেনে প্রচুর গোলাবারুদ এবং পাকবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা রয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে অপারেশন চালাতে হবে। বৈঠকে বসলাম অন্য কমান্ডারের সঙ্গে। কিন্তু মতের মিল হল না। মন খারাপ হয়ে গেল। আমি সিদ্ধান্তে অটল। অপারেশন হবেই। আমার অনুগত সদস্যদের প্রস্তুতি নিতে বললাম। ঐ দিন বেলা ১১টার দিকে একজন গোয়ালার ছদ্মবেশে সুকানপুকুর এলাকায় শত্রুর অবস্থান ভালোভাবে দেখে আসি। দেখতে পেলাম ৮ বগির একটি ট্রেন দাঁড়ানো। এর দুটি বগিতে পাকবাহিনীর রেশন, ১টি কয়লার ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের সামনে ২টি পাথরটানা বগি। পাকবাহিনীর একটি কোম্পানি এখানে। হয়তো তারা বগুড়া থেকে ঢাকায় বদলির জন্য এখানে থেমেছিল। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আরো ২/৩ জন কমান্ডার অপারেশনে

যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শুরু হয়ে যায় অপারেশনের প্রস্তুতি। ১০টি এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন, টিএনটি ২৫ পাউন্ড, ইলেকট্রিক ডেটোনেটর ৬০০ ফুট, কর্ডেক্স, ৫টি এলএমজি নিয়ে ২১ জনের দল আমরা সন্ধ্যার দিকে শত্রুসেনাদের আশপাশে গিয়ে অবস্থান নিলাম। অপারেশনে যাওয়ার আগে খবর পেলাম পাকবাহিনীর দোসররা বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। মাথায় কোনো কিছু আসছে না। বাড়িতে তিন মাসের পুত্রসন্তান। ঘরে কিশোরী স্ত্রী। বাবার একমাত্রসন্তান হওয়ায় পরিবারের অনুরোধে অল্প বয়সে বিয়ে করতে হয়েছে। যাই হোক মাথা থেকে সব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু অপারেশনের পরিকল্পনা আঁটছি। সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হল এন্টি-ট্যাঙ্কমাইন বসানোর কাজ। প্রায় ঘণ্টা তিনেক সময় লেগে গেল সবকিছু ঠিকঠাক করতে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ইলেকট্রিক ডেটোনেটরের সাহায্যে ১০টি এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন ও ২৫ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ ফাটানো হল। পরদিন ভোরে সেখানে গিয়ে দেখলাম পাকবাহিনীর ১৩৯টি লাশ পড়ে আছে। কোনো সেক্টরে একটি অপারেশনে পাকবাহিনীর এত সদস্য মারা যায় নি। অপারেশন শেষে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। শুনলাম চরমপত্র পরপর তিন দিন এই অপারেশনের সাফল্য সম্পর্কে প্রচার করেছে। এলাকায় রব পড়ে গেল। ব্যাপক সংবর্ধনা দেওয়া হল। এসবের খবর পাকবাহিনীর কাছে চলে গেল। যে কোনো মূল্যে তাদের দুলুকে চাই। পাকবাহিনী মাইকে ঘোষণা দিল দুলুকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার। কর্নেল নূরুজ্জামান আমাকে বললেন, "তুমি কখনো ধরা পড়বে না। ধরা পড়লে আত্মহত্যা করবে।" অপারেশনে যাবার আগে স্যারের কথামতো গ্রেনেডটি সঙ্গে নিয়েছিলাম। কারণ এখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় শতভাগ। ধরা পড়লে নিজের গ্রেনেড দিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেব এই ছিল পণ। এই অপারেশনের সাফল্য একের পর এক অপারেশনের অনুপ্রেরণা ও সাহস দিয়েছে।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা সদস্যরা তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে এসে রিপোর্ট করত। এখানে তাদের জেলাওয়ারী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে দেওয়া হত। আর এই জেলা গ্রুপ থেকে ১০ থেকে ২০ জনের ছোট ছোট দল তৈরি করা হত। এসব প্রস্তুতির দায়িত্ব মেজর মকসুল চৌধুরী ও অন্যান্য অফিসারের ওপর ন্যস্ত ছিল। দলের নেতা এরাই নির্বাচন করতেন। দলপতি হওয়া নির্ভর করত দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে কে কোথায় ও কীভাবে অ্যাকশন করবে সেসব প্রস্তাবের ওপর। অ্যাকশন করে ফিরে আসা দলগুলোর কার্যবিবরণ শুনে দল ও দলপতি পুনর্গঠন করা হত। সাধারণত পরিবর্তন প্রয়োজন হত না।

পাবনা এলাকায় এরকম একটি দলের গ্রুপ লিডার ফিরে আসার পর আমার সাথে একান্ত আলোচনা করার আগ্রহ দেখায়। তার থেকে জানতে পারি মুক্তিবাহিনীর সদস্য ব্যতীত দেশীয় কয়েকটি রাজনৈতিক বাহিনীর সদস্যরাও অভ্যন্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম জারি রেখেছে। এসব সদস্য স্পষ্টভাবে তাদের পরিচয় দিত না। তার রিপোর্ট থেকে বুঝা গেল এদের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানবিরোধী ও স্বাধীনতা পক্ষের সশস্ত্র প্রতিনিধি।

স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্রের সঙ্গেও তারা মুখোমুখি হয় এবং তারা সংঘাত পর্যায়ে চলে যায়। গ্রুপ লিডারের বিচক্ষণতার কারণে পরামর্শের মাধ্যমে এই বিরোধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। আমাকে প্রশ্ন করেছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এরকম কয়টি বাহিনী কাজ করছে এবং কে কোন পক্ষে? প্রশ্নটি আমাকে সমস্যায় ফেলে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে গঠিত সশস্ত্র বাহিনী এবং একাধিক রাজনৈতিক বাহিনীর অঙ্গসংগঠনগুলোর সংখ্যা কত এবং তারা কী উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সংগ্রামরত ছিল তা আমার জানা ছিল না। আমি তাকে কেবল এই পরামর্শ দিতে পেরেছিলাম যে, স্বপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং স্থানীয় লোকদের পরামর্শে যারা বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল তাদের খবরাদি নিয়ে এড়িয়ে যেতে। কোনো ক্রমে যেন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটে সে পদক্ষেপ নিতে। পরামর্শ দেওয়া সোজা। আমাদের যেসব দল দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, তাদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ ছিল না। এখানে এটুকুই বলতে পারি যে আমাদের গ্রুপ লিডারদের বুদ্ধি, মেধা ও বিচক্ষণতার জন্য এরকম সংঘর্ষ কখনো ঘটে নি। পাবনা এলাকায় এই সমস্যা ছিল সবচেয়ে প্রকট।

ব্যর্থতা ও সফলতা নিয়েই দেশের অভ্যন্তরে আমাদের অ্যাকশনগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই দলগুলো দেশের মধ্যে ১০/২০ দিন অবস্থান করে ফিরে আসত। দলপতির থেকে তাদের অ্যাকশনের বিবরণ শুনতাম। একাধিক দল তাদের অ্যাকশন অতিরঞ্জিত করত, যা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তাদের দাবিসমূহ টিকত না। তবে তাদের তেমন ভর্ৎসনা করে ক্ষতি ছাড়া লাভবান হওয়া যেত না। অ্যাকশন থেকে ফিরে আসা কিছু কিছু দল শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসার পর তাদের সামান্য কিছু অস্ত্রাদিও ফেলে আসত। এই অপরাধ ক্ষমার যোগ্য ছিল না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এসব রিপোর্ট পেয়ে খুবই বিরক্ত হত। শত্রুপক্ষ যে কেবল পাকিস্তানিরাই ছিল তা নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির আকস্মিক আক্রমণ আমাদের সদস্যদের ওপর আসত। আমাদের অস্ত্রাদি স্বদেশ বাহিনীর হাতে পড়লে আমি তেমন বিরক্ত হতাম না। রাজাকার বা পাকিস্তানিদের হাতে পড়লে আমি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতাম। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধই আমাদের শেষ যুদ্ধ নয়। ভারত কর্তৃক অধিকৃত হয়ে থাকায় এটা মনে জাগত। দেশে সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য হয়তো বা নতুন সংগ্রামের সম্ভাবনাও এসে যায়। সুতরাং আমাদের ফেলে আসা অস্ত্রগুলো দেশের অভ্যন্তরে যারা পক্ষে সংগ্রাম করছিল তাদের হাতে পড়া ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর ছিল না। কখনো কখনো মনে হত যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্ব শেষ হলে শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা হতে পারে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও তাদের কার্যক্রম দেখে আমার বিশ্বাস জন্মায় যে এই শ্রেণী জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য নয়। এদিকে আমাদের ছেলেদের মনোভাবও কিছুটা আঁচ করতে পারতাম। যদিও তাদের সাথে কোনোদিন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা করতাম না। কারণ বিষয়টি ছিল স্পর্শকাতর। এতৎসত্ত্বেও আন্দাজ করতে পারতাম যে মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য মওলানা ভাসানীর সাম্যবাদী দীক্ষায় বিশ্বাসী ছিল।

উপরোক্ত বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও আওয়ামী লীগ বেশ সজাগ ছিল। বামপন্থায় বিশ্বাসী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের রণাঙ্গনে নামানো সম্ভব। ভারতীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে তারা পৃথক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে নয়।

সম্ভবত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরই এই অনুমোদন দেওয়া হয়। এই কথা আমি বলছি এ কারণে যে, ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল বামপন্থী কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজশাহী সাব-সেক্টরের নিকটস্থ স্থান দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। আমাদের দ্বারা তারা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সম্ভবত তারিখটা ছিল ১৪ ডিসেম্বর।

তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে এক যুবক ১০/১৫ জন সঙ্গী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এরা সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু বামপন্থী মতধারায় বিশ্বাসী বলে এদেরকে বিভিন্ন সেক্টর থেকে বিতাড়িত করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম দলটির সব সদস্যই রাজনৈতিকভাবে বেশ সচেতন এবং তাদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের। কোথায়, কীভাবে এবং কোন এলাকায় তারা যাবে এসব বর্ণনা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম যে এরা সত্য সত্যই লড়াইয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে এবং অনুমান করলাম যে আমাদের যে কোনো গ্রুপের সমতুল্য। তাই তাদের অস্ত্র দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরে শুনতে পাওয়া গেল যে, এই দলটি সীমান্ত অতিক্রমকালে এক আওয়ামী লীগ নেতা, যিনি সেখানে ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনা করছিলেন তার হাতে পড়ে যায় এবং সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। '৭২ সালে এই ঘটনাটি আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং তখন থেকে নাকি এই মহলটি আমাকে চীনপন্থী বলে অভিহিত করেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিকে আমার সেক্টরের মধ্যে মোহেদীপুর সাব-সেক্টরই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর নেতৃত্বে ছিল ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। পাকিস্তান আমলেই সে কমিশন পায়। '৭১ সালে সে পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় সীমান্তে কর্মরত ছিল। এই সীমান্ত থেকে জাহাঙ্গীর আরো তিন জন বাঙালি অফিসার একত্রিত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লিতে চলে আসে। এই যুবকটি ছিল নেহায়েত অল্প বয়সী। সম্ভবত ২২/২৩ বছর বয়স্ক। তার স্বদেশ প্রেমের তুলনা হয় না। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারায় সে নিজেকে ধন্য মনে করত। আলাপ-আলোচনার মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম যে নানাবিধ বিষয়ে পড়াশোনা করত সে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়। আমার ছেলে নদিমের কাছ থেকে জানতে পারি জাহাঙ্গীর চেগুয়েভারার ভক্ত ছিল এবং তার আদর্শ ব্যক্তির বই ও লেখাসমূহ নিয়ে তার অধীনস্থ সচেতন যুবকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত।

তার ব্যক্তিগত জীবন আমাকে আকর্ষণ করে। অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে লুঙ্গি গেঞ্জি ও গামছা পরে দিনগুলি কাটাচ্ছিল। এই পরিধানে তার বিন্দুমাত্র সংকোচ ছিল না।

আমার সামনে তো বটেই ভারতীয় উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে এই একই ড্রেস পরে থাকত। সর্বদাই চিন্তা করত কীভাবে তার সদস্যদের অ্যাকশনে ব্যস্ত রাখা যায়। জানতে পেরেছিলাম যে সে রেডিওতে গানও শুনত না এবং তার ছেলেরা কদাচিৎ আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলে ভর্ৎসনা করত। সোনা মসজিদ এলাকায় তার সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল বেশ কয়েকটি পাকা ঘরকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তান আমলে এগুলো ছিল ইপিআর কোয়ার্টার। জাহাঙ্গীর কিন্তু এখানে রাত কাটাত না। প্রতি রাতেই সে সম্মুখে অবস্থিত কোনো-না-কোনো এক ব্যাঙ্কারে তার সদস্যদের সঙ্গে রাত যাপন করত। এটাও শুনতে পেয়েছিলাম তার প্রাপ্ত মাসোহারা নিজের জন্য খরচ করত না। সবটুকুই তার সদস্যদের কল্যাণের জন্য দিয়ে দিত। জাহাঙ্গীরের আদর্শ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা সাব-সেক্টরের অন্যান্য সদস্যদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। কথায় কথায় শুনেছিলাম এখানে ৭টি ছেলে একান্ত বন্ধু হিসেবে একটি ছোট্ট দল করেছিল। লুঙ্গি গেঞ্জি গামছা ছাড়া এই দলের মধ্যে দুটি প্যান্ট ছিল। মাঝে মধ্যে কখনো ছুটি দেওয়া হলে এই ২টি প্যান্ট ব্যবহার করেই খুব খুশি থাকত।

আমার পরিবারও মোহেদীপুরে অবস্থিত ছোট্ট একটি হাসপাতালে থাকত। হাসপাতালটি ছোট হলেও মোয়াজ্জেম নামক ডাক্তার এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়াও বড় আবশ্যকীয় অপারেশনও করত। বেশ কয়েকটি বড় অপারেশনও তাকে করতে হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরকে আমার স্ত্রী নিজের ছেলের মতো স্নেহ করত। কথায় কথায় সে একবার আমার স্ত্রীকে বলেছিল যে, কোনো একটি পাকিস্তানি সেনাকে সরাসরি গুলিবিদ্ধ করার সৌভাগ্য তার হয় নি। কবে যে তার আশা পূরণ হবে সে প্রতীক্ষায় ছিল। সম্ভবত এই কারণেই অ্যাকশনের সময় তাকে সর্বাগ্রে দেখা যেত। তার জীবনের শেষ দিনে যখন সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাকে অ্যাকশনের সর্বাগ্রেই দেখা গিয়েছিল। এই প্রবণতা থেকে বিরত থাকার জন্য জাহাঙ্গীরকে আমি কয়েকবার সতর্কও করে দিয়েছিলাম।

এখানে আমার একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে। আমার বড় মেয়ে নায়লার শখ ছিল শত্রুর সাথে সংঘর্ষের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার। একদিন আমি সোনা মসজিদ হয়ে মহানন্দা তীরে অবস্থারত আমাদের বাহিনী পরিদর্শন করতে যাচ্ছিলাম। এখানে খবর এসেছিল যে শত্রুপক্ষের সাথে বেশ ভালো রকম সংঘর্ষ চলছে। নায়লা ধরন দিল যে আমার সাথে সে রণক্ষেত্রে যাবে। আমি ধমক দিয়েও তাকে বিরত করতে পারি নি। সে আমার জিপটা আঁকড়ে ছিল। সময় নষ্ট না করে তাকে আমি জিপে উঠিয়ে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হই। মহানন্দা নদীতে অবস্থানরত আমাদের বাহিনীর শ'দুয়েক গজ পেছনে একটি নিরাপদ স্থানে জিপটি রেখে নায়লাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাই। ঠিক এই সময় শত্রুপক্ষের মর্টারের গোলা পড়তে শুরু করে এবং একটি গোলা আমার জিপের পেছনে পড়ে। এই বেগতিক অবস্থায় আমি নায়লাকে এক গেরিলা escort দিয়ে জিপে ফেরত পাঠাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করি।

সন্তর্পণে মহানন্দার তীরে এক বাঙ্কারে পৌঁছে পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করি। রিপোর্ট শুনে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারলাম নদী তীরবর্তী অবস্থান থেকে উভয় পক্ষের গুলিবিনিময় হচ্ছে। পাকিস্তানিরাই নাকি আগে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সংবাদবাহকের মাধ্যমে বাঙ্কারগুলোতে নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন অহেতুক গোলাগুলি বন্ধ রাখে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি একে-৪৭ রাইফেল বহন করতাম। এটিকে ব্যবহার করার কোনোদিন সুযোগ পাই নি। স্বাধীনতা যুদ্ধ যে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে এটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। তাই বাঙ্কারে বসে সম্ভবত শত্রুপক্ষের অবস্থান লক্ষ্য করে একটি একটি করে দুটি গুলি ছুড়েছিলাম এবং এই অহেতুক ছোড়াই ছিল প্রথম ও শেষ।

মহানন্দা পার হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার খুব ইচ্ছা ছিল ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের। তাকে একটা প্ল্যান করতে বলি। পরামর্শ দিয়েছিলাম এই প্ল্যানে মেজর গিয়াস, লে. রশীদ এবং লে. রফিকের বাহিনীর সমন্বয় ঘটাতে। আমি তাকে আরো জানিয়েছিলাম যে, ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে মোহেদীপুরে ভারতীয় অবস্থান থেকে এগিয়ে এসে শিবগঞ্জ অতিক্রম করে মহানন্দার এলাকায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব। অবশ্য পরবর্তীকালে এটা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত ভারতীয় মাউন্টেন ব্যাটারিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের সকল সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তান বাহিনীদের মুখোমুখি সংঘর্ষের অগ্রগতি ঘটেছিল। শত্রুপক্ষের পিছু হটার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের প্রেম সিং এবং ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের লাছমান সিং লেহাল দুজনেই তাদের স্টাফ অফিসার নিয়ে সীমান্তে বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনে ব্যস্ত থাকায় তাদের থেকে যুদ্ধের সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও আমার দুর্ভাগ্য যে আমার কাছে কোনো ট্রানজিস্টারও ছিল না। আমি এক সাব-সেক্টর থেকে আরেক সাব-সেক্টরে ছোটাছুটিতেই ব্যস্ত ছিলাম।

প্রত্যুষে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি প্রেম সিঙের এক সংবাদবাহক। লে. ইদ্রিস সত্য সত্যই অ্যাকশনে মারা গিয়েছে কি না প্রেম সিং জানতে চান। এটা শুনেই আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। এ খবর তো আমি নিজেই জানতাম না। কালবিলম্ব না করে আমি দ্রুত হামজাপুরের দিকে রওনা হই। পথিমধ্যে এক ভারতীয় ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা হয় যে কিনা ইদ্রিসের সাথে জড়িত ছিল। সে খবর দিল যে ইদ্রিস বেঁচে আছে কিন্তু আহত হয়েছে। যানবাহন না থাকায় তাকে গরুর গাড়িতে করে পেছনে সরিয়ে নিয়ে এসে ভারতীয় ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে ভর্তি করা হয়েছে। সে ভালোই আছে এবং কোনো কিছু হয় নি। আমি আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু তাকে দেখতে যাওয়া হয় নি। আমার মনটা পড়ে ছিল মহানন্দা তীরে জাহাঙ্গীরের বাহিনীর ওপর।

সাত নম্বর সেক্টরের যুদ্ধকালীন কার্যক্রম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র। সেক্টরের অধীনে ছিল রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রংপুর জেলার অধীনস্থ

দুটি থানা। এই সেক্টরের স্ট্র্যাটেজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থানের পতন হলে ঢাকা অভিমুখে নগরবাড়ী ঘাঁটি দখল সহজ হয়ে পড়ে। তবে ঘাটের পতন ঢাকা অভিমুখী যাত্রা নিশ্চিত করে না, কারণ পদ্মানদী অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীর যে কোনো বাহিনী দ্বারা নগরবাড়ী থেকে আরিচায় সৈন্য স্থানান্তরিত করা দুরূহ সমস্যা।

রাজশাহী শহর ছিল বিভাগীয় কেন্দ্র। শহরের একটি ঐতিহ্যও রয়েছে। এর পতন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর প্রভাব ফেলত। বগুড়া অঞ্চল তুলনামূলকভাবে অনেক শুষ্ক এবং ট্যাঙ্কবাহিনী পরিচালনার যোগ্য। এ কারণে এখানে উভয়পক্ষের সামান্য ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়েছিল, যা শুরু হয়েছিল হিলি এলাকায়। ভারতীয় বাহিনী হিলি অপারেশনে পাকিস্তানের সাথে সম্মুখযুদ্ধে সফল হতে না পারায় পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার শর্মার বাহিনীকে ব্যবহার করেছিল আরো উত্তর–পূর্বে এবং এই বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে মূল রাস্তা বাইপাস করে ফুলবাড়িয়া-জয়পুরহাট সড়ক দিয়ে বগুড়া অভিমুখে অভিযান চালিয়েছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এই প্ল্যান খুবই সফল হয়েছিল। হানাদার বাহিনী দ্রুত পিছু হটতে শুরু করে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে উভয় পক্ষের সম্মুখযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছিল। ভারতীয় অগ্রগতি হিলিতে যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল সেরকম বাধার সম্মুখীন তাদের আর হতে হয় নি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সম্ভবত ধরেই নিয়েছিল যে বাংলাদেশের সাত নম্বর সেক্টরের অঞ্চলটি বেশি দিন তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। তাই সময় থাকতেই পদ্মা পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে ঢাকা শহরকে রক্ষা করার জন্য তাদের বাহিনীকে স্থানান্তরিত করে। এই প্ল্যান গ্রহণ না করলে নগরবাড়ী এলাকায় তারা অবরুদ্ধ হয়ে যেত।

এটাও মনে রাখতে হবে যে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ এলাকায় যুদ্ধের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছিল। নগরবাড়ী থেকে পাকিস্তানের সৈন্য সময়মতো অপসারিত না হলে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারত।

১৬ ডিসেম্বরের পরে আমি একসময় নগরবাড়ী ঘাট পরিদর্শন করতে যাই। সেখানে হানাদার বাহিনীর ফেলে যাওয়া একাধিক এন্টি–ট্যাঙ্ক তোপ দেখতে পাই। অবস্থান পরিলক্ষণ করে বুঝতে পারলাম যে এই ঘাট থেকে তারা অতি দ্রুত পলায়ন করেছে। সম্ভবত স্থানাভাবে বহু মালামাল ছড়িয়ে–ছিটিয়ে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা এখন পরিষ্কার যে পাকিস্তান ঢাকা শহরকে রক্ষা করার জন্য উত্তরাঞ্চলে তাদের সেনাবাহিনীকে দ্রুত অপসারণ করে নিয়ে যায়।

তবে এটা বলা ভুল হবে যে পলাতক বাহিনী ১৬ ডিসেম্বরের আগে রাজশাহী বগুড়া অঞ্চল থেকে তাদের সমস্ত বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে পদ্মার পূর্ব পাড়ে নিয়ে গেছে। আমি জানতে পেরেছিলাম ব্রিগেডিয়ার পান্নুর বাহিনী রাজশাহী হয়ে নাটোর দখল করে এবং এখানে শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্যসামন্ত আত্মসমর্পণ করে।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজশাহী থেকে আমি তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টার হয়ে কালবিলম্ব না করে বগুড়া অভিমুখে রওনা হই। আমার ধারণা ছিল ব্রিগেডিয়ার শর্মার ব্রিগেড এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গেরিলা বাহিনীকে বগুড়া শহর দখল করার অপারেশনের পথে ধরে ফেলতে পারব। কিন্তু এই অপারেশন অতি দ্রুতগতিতে চলে। শত্রুপক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। এর কারণও ছিল। মনে হয় হানাদার বাহিনী তাদের স্থানীয় এজেন্ট রাজাকারদের থেকেও তথ্য পাচ্ছিল যে অদম্য বেগে গেরিলা বাহিনীরা তদের পিছু হটার পথ রোধের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছিল। এ ছাড়া আগে উল্লেখ করেছি যে ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহের দিক থেকে শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। এসব কারণে তারা বগুড়া শহরকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টা করে নি।

বগুড়া যাত্রার পথে আমি উল্লিখিত কারণে আমাদের বাহিনীর সন্ধান পাই নি। কোনো তারিখ মনে নেই। এক বিকালে শর্মার ব্রিগেডের রিয়ার হেডকোয়ার্টারে পৌছাই। এখান থেকে জানতে পারি যে যৌথবাহিনী ইতোমধ্যে বগুড়া শহর দখল করে নিয়েছে এবং শত্রুপক্ষ আরো পিছু হটে গেছে। এখানে যখন বিশ্রাম করছিলাম তখন ভারতীয় বাহিনীর মিলিটারি পুলিশের এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয় এবং তার কাছ থেকে বিস্তারিত খবরাদি জানতে পারি। ভারতীয়রা শহর দখল করে ইতোমধ্যে শহরের সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস এবং গেস্ট হাউস দখল করে অবস্থান নিয়েছে। এই তথ্য পেয়ে আমি খুবই খুশি হলাম এবং স্থির করলাম যে সে সন্ধ্যায় আমি বগুড়া রওনা হব। এই মতবিনিময়ের সময় ক্যাপ্টেন আমাকে একটি অনুরোধ করেন। তার পকেট থেকে একটি দরখাস্ত বের করে তার আবেদনপত্র আমাকে সমর্থন করতে বলেন। বগুড়ায় অবস্থানরত ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করা হয়েছিল এই মর্মে যে ক্যাপ্টেন সাহেবকে যেন বগুড়া শহরের সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই উপরোক্ত দরখাস্ত দেখে। অবাক হই, দুএকদিনের মধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কীভাবে বগুড়া শহরের প্রশাসনের দায়িত্ব পাবার কথা ভাবছিল এবং প্রশাসনের নিমিত্ত বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করার চিন্তা করছিল। আমি সেই দরখাস্তে আমার স্বাক্ষর দেই এবং গল্পচ্ছলে ব্যাপারটি এড়িয়ে যাই। তবে মনে মনে খুবই শঙ্কিত হই যে এত শিগগির কীভাবে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফেলেছে।

কিছু দিন আগের একটি ঘটনা এখন মনে পড়ছে। যৌথবাহিনী যখন দ্রুত ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন দখল করে এগুচ্ছিল তখন বাংলাদেশে পাকিস্তানি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল। অপারেশনের আশপাশের এলাকা থেকে স্থানীয় লোকেরা স্থান ত্যাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিল। এই শূন্যতার দরুন স্থানীয় বাজার ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। জেনারেল লেহ্যল আমাকে খবর পাঠান যে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি যেন বাংলাদেশ সরকারের

স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের নির্বাচিত সাংসদদের নিজ নিজ এলাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলি।

এই নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় মিলিটারি কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠকে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করছিল এক ব্রিগেডিয়ার যে কিনা ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে আমার সাথে ছিল। মুক্ত এলাকাগুলোতে আমাদের সংসদ সদস্যের যাবার প্রস্তাবটি যখন উত্থাপিত হয় তখন আমাদের সাংসদরা বলেছিলেন যে তারা কী করে নিজ এলাকায় প্রবেশ করবেন। প্রবেশের জন্য তাদের ভিসা দেওয়া হয় নি। এ কথা শুনে আমার বন্ধু ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং আমি লজ্জিত হই। কোথায় যে মুখ রাখব ভেবে পেলাম না। নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য ভিসাপ্রাপ্তির কথাটা কীভাবে আমাদের সংসদ সদস্যদের মনে উদয় হয়েছিল তা আজো ভেবে পাই না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব আসাতে আমার বন্ধু অবশ্যই খুব আশ্চর্য হয় এবং ব্যঙ্গ করে বলে যে এই বৈঠকেই সে নিজে তখনই ভিসা প্রদান করবে।

সেদিন সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার শর্মার "রিয়ার" হেডকোয়ার্টার থেকে বগুড়া শহর অভিমুখে রওনা হই। যাত্রার শুরুতেই প্রথম কয়েক মাইল রাস্তা বেশ খারাপ থাকলেও গাড়িতে উঠে খুব ভালো রাস্তা দেখতে পাই। এই অঞ্চলে '৭১-এর আগে আসি নি এবং এমন উন্নতমানের সড়ক দেখে খুবই খুশি হয়েছিলাম। মনে করেছিলাম মাগরেবের ওয়াক্তের মধ্যে পৌঁছে যাব। তবে পথিমধ্যে আমাকে কয়েকবার থামানো হয় এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা ও যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে লোকদের সাথে আলোচনা এড়াতে পারি নি। সুতরাং বগুড়া পৌঁছতে দেরি হয়।

শহরটি তেমন আলোকোজ্জ্বল ছিল না। যতদূর মনে পড়ে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় শহরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ভারতীয় বাহিনীর সদস্যদের খোঁজ পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল সব যেন নিস্তব্ধ নীরব। আমাদের ছেলেদের খোঁজ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে আমি রাত্রিযাপনের জন্য একটি জায়গার সন্ধান করতে থাকি। ভারতীয় এমপি ক্যাপ্টেনের রিপোর্টটি মনে রেখে সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস, পর্যটন কেন্দ্র সব জায়গায় ঢুঁ দিয়ে বুঝতে পারলাম সেখানে কোনো স্থান পাওয়ার সুযোগ নেই। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম বগুড়ার ডিসির বাড়িতে যাওয়ার। অবশ্য মনে সন্দেহ জাগল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হয়তো বা ডিসিকে অপসারণ করেছে এবং তার নির্ধারিত আবাস দখল করে নিয়েছে। তবু সেই মুখেই রওনা হলাম।

ডিসির বাড়িটাও ছিল নিস্তব্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে ঢুকতে সামান্য অসুবিধা হয়েছিল। আমি উর্দি পরিহিত একজন সামরিক অফিসার ছিলাম না। সাদামাটা প্যান্ট-শার্ট পরেই ছিলাম। তবে কাঁধে একে-৪৭ রাইফেলটি ঝুলছিল। অন্যথায় হয়তো ডিসির বয়-বেয়ারা আমাকে প্রবেশ করতে দিত না।

ডিসির সাথে সে রাতে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল সেসব মনে পড়ে না। সম্ভবত তিনি আমাকে সশস্ত্র দেখে আশ্বস্তবোধ করছিলেন না। আমার পরিচয়টা তাকে

বুঝিয়ে দিলাম এবং পরদিন সকালে আমি অন্যত্র আশ্রয় নেবার কথা বললাম। ডিসিকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি বিনয়ী ও গম্ভীর প্রকৃতির, স্বল্প বয়স্ক সরকারি কর্মচারী।

পরে জানতে পারি ডিসির নাম ছিল মনজুরুল করিম। তিনি তৎকালীন সিএসপি ক্যাডারের অফিসার ছিলেন। তিনি তার আবাসের নিচের তলায় ছোট একটি কামরায় আশ্রয় নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান, যা আমার কাছে রাজপ্রাসাদতুল্য ছিল। প্রত্যুষে উঠে দেখি বাড়ির লোকজন সব সজাগ। আমার প্রস্থানের প্রস্তাব দেওয়াতে বাড়ির লোকজন জানালো যে আমি যেন ডিসি সাহেবের সাথে নাস্তা করে যাই। এই কাজটি সম্পন্ন হল দোতলার এক কক্ষে। আমাদের দুজনের মধ্যে আলাপ–আলোচনার কেবল একটি বিশেষ কথাই এখন মনে পড়ে। সম্ভবত তাকে বলেছিলাম যে তিনি যেন মনে করেন তিনিই বাংলাদেশের সরকারের কর্মচারী এবং পদমর্যাদা বজায় রেখে তিনি যেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সংযোগ রাখেন। তার মর্যাদা যদি কোনো প্রকার ক্ষুণ্ন হয় তা হলে সংবাদটি যেন মুক্তিবাহিনী সদস্যের কাছে পৌঁছে দেন।

পরদিন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আমার তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয় নি। ভারতীয়দের দেখে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাদি তাদের থেকে তেমন সংগ্রহ করতে পারি নি। সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম যে ভারতীয় বাহিনী বোধহয় আর আগের মতো অগ্রসরের চেষ্টা করবে না। বগুড়া শহরের ওপরই তারা কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যস্ত। ব্রিগেডিয়ার শর্মার সাথে আমার দেখা হয় নি। এ দিন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে আমার দেখা হয় নি। জানতে পারলাম যে শহর থেকে কিছু দূরে তাদের অবস্থান নিতে হয়েছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যা পরে জানতে পারি। ডিসেম্বরের স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিযানে সর্বক্ষেত্রেই মুক্তিবাহিনীকে শহরাভিমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। আর তারা স্থানীয় লোকজন এবং স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত গেরিলা সদস্য অবস্থান নিয়েছিল তাদের সাথে সংযোগ করে শহরগুলি দখল করতে অসুবিধায় পড়তে হয় নি। এর প্রধান কারণ ছিল হানাদার বাহিনীরা পালাতে ব্যস্ত ছিল। তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল।

পরে শুনতে পাই যে বিভিন্ন শহর মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দখলের খবর পাওয়ার পরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী সৈন্য হিসেবে প্রবেশ করে তাদের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীকে শহরের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান নিতে বলে প্রথম অনুপ্রবেশের কৃতিত্ব নেওয়ার কৌশল নিয়েছিল। শুনতে পাওয়া যায় যে চট্টগ্রাম শহর পতনের পর শহরবাসীরা ছেলেমেয়েসহ হাতে মালা নিয়ে এসে মুক্তিবাহিনী সদস্যদের গলায় পরানোর জন্য অপেক্ষা করে প্রথম দুদিন কোনো সন্ধান পায় নি। ভারতীয়দের এই ব্যবহার জনসাধারণকে হতাশ করে। প্রথম প্রবেশের গৌরব অর্জন মুক্তিবাহিনী সদস্যদের নিতে না দেওয়ার কাজটি মহৎ ছিল না। বলা যায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

তবে এ ঘটনা সাত নম্বর সেক্টরে ঘটে নি। রাজশাহী ও দিনাজপুরে আমাদের ছেলেরাই প্রথম প্রবেশ করে এবং বিজয়ের উৎসব ও প্যারেড ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের পূর্বেই করেছিল। লুঙ্গি গামছা পরা অস্ত্রধারী মুক্তিবাহিনী আনুষ্ঠানিক প্যারেড ও স্যালুট গ্রহণ করার আয়োজন মেজর গিয়াসের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজশাহী শহরে।

তবে ঢাকায় মেজর হায়দারের বাহিনীর দৃঢ় অবস্থান ও সক্রিয় ভূমিকা থাকায় খবরাদি তাদের বেতার ও টিভি প্রচার করেছিল। এই দুটি কেন্দ্র খুলে রাখার বন্দোবস্ত তাৎক্ষণিকভাবে মেজর হায়দারের সদস্যদের নিতে হয়েছিল। সম্ভবত সর্বত্রই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সজাগ, সচেতন ও সক্রিয় থাকার কারণে ভারতীয়রা স্থানীয় প্রশাসনে নাক গলানোর চেষ্টা থেকে বিরত ছিল।

সাত নম্বর সেক্টরের পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি যে ডিসেম্বর মাসে যখন একের পর এক এলাকা শত্রুমুক্ত করা শুরু হয় তখন সেখানে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কী হবে সেসব সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকার থেকে কোনো নির্দেশাবলি পাই নি। বরং আমরা নিজেরাই চেষ্টা করেছিলাম স্থানীয় নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিদের স্ব-স্ব এলাকায় প্রশাসনের দায়িত্বে বসাবার জন্য। এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি। এর আগেও উল্লেখ করেছি যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ভিসার আবেদন করেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে আমরা আশা করতাম যে বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচিত সাংসদরা মুক্তিফৌজের বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টরসমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবেন। তাদের সক্রিয় সাহায্য যদি এসব স্থানে থাকত তা হলে গেরিলাদের অ্যাকশনগুলি আরো সুপরিকল্পিত হত। তবে তাদের উপস্থিতিতে সাত নম্বর সেক্টরে রায়ানপুর টাউনের এমপি খালেদ মিয়াকে মালদা শহরে অবস্থান নিয়ে ভোলাহাট সাব-সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সাহায্য করতে দেখেছি। রাজশাহী, শিবগঞ্জ ও কানসাট এলাকার এমপি ডা. মন্টুর মোহেদীপুর সাব-সেক্টরে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাকে মহানন্দা নদীর পাড় থেকে একবার রাইফেল হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীরের ট্রুপসদের সাথে শত্রুমুখে অগ্রসর হতেও দেখেছি।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের একটি ঘটনা। আমার কন্যা লুবনা মরিয়মের কাছ থেকে শুনেছিলাম। শিবগঞ্জে একটি সুনির্মিত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল। মুক্তিবাহিনী এটাকে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করছিল। এ সময় হতাহতের সংখ্যা অধিকতর ছিল। প্রায় ৪০ জন গেরিলা সদস্য এই কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিল। এ অবস্থায় সহসা ৫/৭ জন আওয়ামী লীগ নেতা হাসপাতালে উপস্থিত হন ডজন দুয়েক কমলালেবু ঠোঙায় করে। আমার মেয়ে অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এতদিন কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করে এবং তাদের পরামর্শ দেয় মহানন্দা নদীর পাড়ে জাহাঙ্গীরের সাথে দেখা করার জন্য। তাদের উত্তর ছিল হতাশাজনক। এদের মধ্য থেকে কেউ একজন নাকি বলেন যে, যেখানে গোলাগুলি হচ্ছে সেখানে সংসদ সদস্যরা যেতে পারেন না। কারণ তাদের জীবনের মূল্য নাকি এক

গেরিলা সদস্য থেকে অনেক বেশি। এর উত্তরে হাসপাতালে ডিউটিরত অনেকে তাদেরকে তাৎক্ষণিক প্রস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিল।

সেদিন বগুড়া থেকে আমি নির্দিষ্ট কোন এলাকায় গিয়েছি মনে পড়ে না। তখন আমার মন ছিল খুব অশান্ত ও উদ্বেগপূর্ণ। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। মন চাইত সর্বত্রই থাকতে। এটাও ঠিক যে আমি এ সময়ে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আর কতদিন চলবে। আমার নিকট কোনো ট্রানজিস্টার না থাকার কারণে যুদ্ধের সঠিক খবরাদি পেতাম না। মনে পড়ে জিপ নিয়ে চলার পথে একবার ছোট্ট একটি চায়ের দোকানে কোনো বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত আংশিক খবরে জানতে পারি যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ঢাকার এলাকায় লিফলেট ছড়াচ্ছিল। অনুমান করতে পারলাম হানাদার বাহিনীর দিন শেষ হয়ে এসেছে। অনুরূপভাবে কোথাও শুনেছিলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বে অফ বেঙ্গল অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল। এই পরাশক্তি বরাবরই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল।

মার্কিন সৈন্য অবতরণে যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এই চিন্তায় কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলাম। তখন মনে পড়ল ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তীকালে সেখান থেকে অপমানজনকভাবে পরাস্ত হয়ে দ্রুত পলায়ন করতে বাধ্য হয়। "টাইম এন্ড স্পেস ফ্যাক্টর", যা সামরিক কৌশলে একটি বিশেষ নীতি নিয়ে চিন্তা করে; আমার মনে হয়েছিল যে সপ্তম নৌবহর বে অফ বেঙ্গলে পৌঁছবার আগেই যৌথ কমান্ড অর্থাৎ ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তাদের আয়ত্তে আনতে পারবে। অনেক পরে জানতে পারি যে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং রাশিয়ার সাব মেরিন সপ্তম নৌবহরের অগ্রসর প্রতিরোধের লক্ষ্যে বে অফ বেঙ্গল তৎপর ছিল। এখন মনে হয় যে মার্কিনি হুমকি প্রতারণামূলক ছিল। পাকিস্তানকে সাহায্য করার ক্ষুদ্র একটি ভূমিকা রাখাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ত্রিশ বছর পর আজ এরকম কথা এত স্পষ্ট করে বলতে পারছি। '৭১-এর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পড়বে মনে করে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। তখন মনকে এই বলেই সান্ত্বনা দিতাম যে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জনমতের সমর্থন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এসব কথা ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতাম। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ আরো জটিলতর হবে মনে জাগত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সমাজে তথ্যাদি সামান্যই শুনতাম বা হাতে পড়ত। সেক্টরের সমস্যাগুলোই ছিল আমার কাছে প্রধান।. তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রচার বিভাগ যদি সব সেক্টরে নিউজ লেটার পাঠাত তা হলে মুক্তিফৌজের মনোবল আরো শক্তিশালী হত। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার ও অবদান অস্বীকার করা যায় না। এগুলো ছিল প্রপাগান্ডামূলক এবং চমকপ্রদ, যেগুলো যুদ্ধকালীন

অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিউজ লেটারগুলো হত আরো বাস্তবভিত্তিক। সেদিন বগুড়া থেকে আমি কোন সাব-সেক্টরে গিয়েছিলাম মনে পড়ে না।

হামজাপুর সাব-সেক্টরে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠলেও স্ট্রাটেজির দিক থেকে তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। হানাদার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছিল এবং কোন অঞ্চলে গিয়ে তারা দৃঢ় অবস্থান নিয়ে যৌথবাহিনীর অভিযান প্রতিরোধ করবে এটাই ছিল চিন্তার বিষয়।

আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না ১৫ ডিসেম্বরের রাতটি কোথায় যাপন করেছি। ১৬ ডিসেম্বরের কথা চিন্তা করলেই সর্বপ্রথম মনে ভাসে আমি সস্ত্রীক জিপ নিয়ে রাহানপুরের নদী তীরে উপস্থিত হই। ভোলাহাট অঞ্চলে একটিও মুক্তিবাহিনীর সদস্য স্বস্থানে ছিল না। নদী পেরিয়ে তারা রাহানপুর চলে গিয়েছিল। স্থানীয় লোকদের থেকে জানতে পারলাম এই টাউনটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে দুএকদিন আগেই চলে এসেছিল। সেখানে আর কোনো সংঘর্ষ হয় নি। ক্ষুদ্র একটি দলকে টাউনে রেখে তারা নাকি নদী পাড়ি দিয়ে খানসামা গ্রাম হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরাভিমুখে চলে গেছে। এটাই আমাদের প্ল্যান ছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম রাজাকার বাহিনীও সমস্ত এলাকা ছেড়ে পিছু হটে গিয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ অভিমুখে রওয়ানা দেওয়ার।

পথে কোনো বিঘ্ন ঘটে নি। নৌকা করে পার হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরে পৌছাই। স্থানীয় লোকদের থেকে জানতে পেরেছিলাম জাহাঙ্গীরের সদস্যরা সবাই শহরটিকে সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে নির্বিঘ্নে এবং বিনা সংঘর্ষে। ঘাট থেকে কয়েক শ গজ দূরে সম্ভবত সেখানকার থানায় তারা অবস্থান নিয়েছে। সস্ত্রীক এখানে পৌছামাত্রই বিরাট উল্লাস ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে আমাদের স্বাগত জানায়। কিন্তু আনন্দময় পরিস্থিতি আমার জন্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। থানায় বসে থাকাকালীন ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের দুএকজন ব্যতীত আর কাউকে দেখি নি। তারা নাকি দলবল নিয়ে শহরে চলে গিয়েছে। অন্য ছেলেদের সাথে কথাবার্তা আদান-প্রদানকালে মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম এবং এ আওয়াজ আসছিল থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে। গুলির শব্দের কারণ সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় কে একজন বলে উঠল যে, 'ওটা কিছু না স্যার, ছেলেরা রাজাকারদের ধরে গৃহবন্দি করছে এবং দুষ্কৃতকারীদের হত্যা করছে।' আমি একদম আঁতকে উঠলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলাম আর যেন একটিও রাজাকারকে হত্যা করা না হয়।

একটু পরে জানতে পারলাম মুক্তিবাহিনীর কিছু স্থানীয় সদস্য শহরের লোকালয় ও বাজারে প্রবেশ করে লুটতরাজ করাতে অফিসারবৃন্দ তাদের ধরে আনার জন্য গিয়েছে। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। মুক্তিবাহিনীরা যে এমন ব্যবহার করবে সেটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। মনে পড়ে যে তখন আমি ও আমার স্ত্রী দুটো বেত হাতে নিয়ে ধরা পড়া লুটেরাদের পেটাতে শুরু করি। এসব ছেলেদের তল্লাশি করে তাদের পকেট ও থলে থেকে সোনাদানা, গয়না ও টাকা উদ্ধার করা শুরু করি। সেক্টরের অফিসারদের

তাৎক্ষণিকভাবে লুটতরাজ বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়াতে খুব খুশি হই। এই দুর্ঘটনা দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই স্থগিত করতে পারা গিয়েছিল। তবে এ কথা ঠিক, স্থানীয় দশ-বিশেক গেরিলা তাদের পরিবারের সঙ্গে তাৎক্ষণিক দেখা করার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বিনা অনুমতিতে শহরে প্রবেশ করে।

বিশৃঙ্খলা, লুটতরাজ, অসামাজিক কার্যকলাপ ও নির্যাতন যে কোনো যুদ্ধেরই একটি অংশ। আবহমান কাল থেকেই এটা হয়ে আসছে। এবং বিজয়ী কর্তৃপক্ষ সৎ ও শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারে নি। সাত নম্বর সেক্টরের একটি গ্রুপ ১৬ ডিসেম্বরের দিকে সৈয়দপুরে অনুপ্রবেশ করে অবস্থান নেয়। এখান থেকে খবর আসে যে মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় সদস্যরা রাজাকারদের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিতে শুরু করেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমি তখনই সংবাদবাহক মারফত খবর পাঠাই যে রাজাকারদের চিহ্নিত করে আটক রাখা বা জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হোক। কোনো অছিলায় যেন বিচারযোগ্য রাজাকারদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়। আমার এই আদেশ কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ আসে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার নির্দেশ ওসমানী আমাদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এই কনভেনশনে আমি বিশ্বাসী ছিলাম। তাই চেষ্টা করেছিলাম এসব অঘটন যেন আমার সেক্টরে না ঘটে। শত্রুপক্ষের ধরা পড়া সশস্ত্র বাহিনীকে গ্রেফতার করা যায় কিন্তু তাদেরকে তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা যায় না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সৈয়দপুর ছাড়া অন্য কোনো সাব-সেক্টরে এই সমস্যা দেখা দেয় নি।

তবে লুটতরাজ অন্য ব্যাপার। নিজেদের বাহিনীর মধ্যেও কিছু সদস্যের মধ্যে সামান্য দুষ্কৃতকারী প্রবণতা বিরাজ করে। স্থানীয় কমান্ডারদের এগুলো সম্পূর্ণরূপে রোধ করা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভব না হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারা যায়।

'৭২-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক সুবেদার, যাকে আমি আগেই চিনতাম, ঢাকায় আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন বিরাট মূল্যবান কার্পেট, যেটি তার বাড়িতে রাখার জায়গা ছিল না। স্বীকার করেন যে তিনি এটি লুটের ভাগ হিসেবে পেয়েছিলেন। আমি তাকে কটুবাক্যে সেই কার্পেটসহ প্রস্থান করতে বলি। অবশ্য বিদায় নেবার আগে তিনি তার রেজিমেন্টের অন্যান্য সদস্যেরও অনুরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করেন। এসব কথা তার থেকে আমি শুনতেও চাই নি। শুনলে ভালোই করতাম। ক্রোধবশত তাকে সে সময় দেই নি।

১৯৫১ সালে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজাদের প্রাসাদে JSPCTS নামক একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল। এই প্রাসাদটি দুরবস্থাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত অতি মূল্যবান আসবাবপত্র ও শৌখিন সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত ছিল। কয়েক

বছরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় এবং আমি নিজেও ৬২ সালে আর্মি ছেড়ে দিয়ে ডেপুটেশনে আসি। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন চৌদ্দ ডিভিশনের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময় ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের মেসে আসার আমার সুযোগ হয়। এখানে এসে দেখতে পাই ভাওয়াল প্রাসাদের মূল্যবান আসবাবপত্র ও শৌখিন সামগ্রী। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তৎকালীন বেশ কজন উচ্চপদস্থ অফিসারের বাড়িতে আমন্ত্রিত হই। এদের অনেকের বাড়িতেও চৌদ্দ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার মেসের দুএকটা করে সামগ্রী যেগুলো ভাওয়াল রাজার প্রাসাদে ছিল সেগুলো দেখতে পাই। সম্ভবত সংক্রামক এই ব্যাধি মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিতেও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আরেকটি ঘটনা দেখেছিলাম। রাজশাহীতে থাকাকালীন ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহের শেষ দিকের এক প্রত্যুষে দুজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে আসে এবং একটি ছোট্ট চিরকুট দেখায়। এই চিরকুটে লেখা ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দুই ট্রাক বোঝাই পাটজাত দ্রব্য যেন বর্ডার ক্রস করতে দেওয়া হয়। এটিতে ছিল এক এমপির স্বাক্ষর। কিন্তু তার অফিসের নাম বা কোনোরকম সিল ছিল না। আমার ছেলেরা ট্রাক দুটোকে আটক করে। তাদের সন্দেহ ছিল যে, এই পাসটি ভুয়া। আমি বিপদে পড়ি। আমি তাদের বাধা প্রদানকে সমর্থন করি। প্রশাসনের কোন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম মনে নেই। তবে এই চালানটি বন্ধ করতে পারি নি। আওয়ামী লীগের কোনো এক প্রভাবশালী কর্মী বর্ডারে উপস্থিত হয়ে ট্রাক দুটি বিপরীত পাড়ে চলে যাবার বন্দোবস্ত করে আসে।

জানুয়ারি মাসে ওসমানীর সাথে সেক্টর কমান্ডারদের এক বৈঠক হয়। মিটিং-এ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা হয়েছিল। এখানে আমি সারা বাংলাদেশের বর্ডার সিল করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রস্তাবটি নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য ফলাফল কিছুই হয় নি। শোনা যায় যে ভারতীয় বাহিনী অজস্র লুটতরাজ সম্পন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। পরে জানতে পারি যে এই ব্যাপারে মেজর জলিলের সেক্টরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্য হয়।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে তরঙ্গপুরের হেডকোয়ার্টারের গচ্ছিত টাকা দিনাজপুর ব্যাংক থেকে তুলতে গিয়েছিলাম। আমার জিপ এবং আমাকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখে অনেক লোকের ভিড় জমে যায়। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছিল এবং করমর্দন করছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উচ্চ স্বরে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'স্যার দেশ তো আপনারা স্বাধীন করেছেন, এই স্বাধীনতা কি বজায় রাখতে পারবেন?' আমি কিছু বলার আগে তিনি পুনর্বার বললেন, 'না, পারবেন না।' ভিড়ের মধ্যে কপালে চন্দন মাখা ১/২ জন মাড়োয়ারি উপস্থিত ছিল। ভদ্রলোক তাদের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বললেন, 'এই সম্প্রদায়ের লোকগুলোকে যদি আপনারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে দেন তা হলে আপনাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।' সম্ভবত তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তার কথাগুলো আজো বারবার মনে পড়ে।

১৬ ডিসেম্বরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে থাকাকালে ছেলেদের মধ্য থেকে শোনা গেল যে সেদিনই কোনো একসময় হানাদার বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করছে। এই খবর শুনে আমি তরঙ্গপুর হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই।

যাবার আগে আমি মেজর গিয়াসউদ্দিনের হাতে সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দিতে চেয়ে আরো কিছু পরামর্শের কথা চিন্তা করছিলাম। তবে তিনি সেখানে উপস্থিত হতে পারেন নি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী সড়কে তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যান্য অফিসারদের গিয়াসের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজশাহী অভিমুখে অগ্রসর হতে বলি। তবে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে উল্লসিত হয়ে বেপরোয়াভাবে যেন অগ্রসর না হয়।

সেদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে কখন প্রস্থান করি এবং কোথায় কোথায় যাই, কার সঙ্গে দেখা হয়, কথার আদান-প্রদান কী হয়েছিল কিছুই মনে পড়ে না, সামান্যতমও নয়। আমি কি আনন্দে ও গর্বে ভেঙে পড়েছিলাম? আর এর কারণই বা কী হতে পারে? ৭১-এর সমস্ত সংগ্রামের দিনগুলোর সুখদুঃখের কথা মনে পড়ছিল। দেশের অভ্যন্তরের খবর সঠিক ও সার্বিকভাবে জানাটা ছিল অসম্ভব। কত সহস্র গ্রাম ও শহর জ্বলেছে সেগুলো প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার আশঙ্কায় কি ভয় পেয়েছিলাম? আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠী তাদেরকে কী অবস্থায় দেখতে পাব বা অনেকের সাথে আর কোনো দিন দেখা হবে না এই দুশ্চিন্তায় ছিলাম? হয়তো বা ভাবছিলাম যে বীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে আমার সেক্টরে, তাদের পরিবারবর্গ আমার কাছে আসবে তাদের প্রিয়জনদের খোঁজ নেবার জন্য। এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণহানির কৈফিয়ত কি আমার কাছে চাইবে? কী বলে সান্ত্বনা দেব এদের মা-বাবাকে। যাক, কেন যে সেদিনের কথা মনে পড়ে না, আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই। আনমনাভাবেই প্রত্যাবর্তন করেছিলাম হেডকোয়ার্টারে। যুদ্ধের কাজ শেষ হয়ে গেলেও যে বহু প্রকার দায়িত্ব নতুনভাবে জেগে উঠবে সেগুলো সমাধানের কথাও হয়তো বা ভাবছিলাম। আনন্দ ও দুঃখ বোধহয় সমভাবে মনে বিরাজ করছিল। ফেরার পথে একবারও মনে করি নি যে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর দিনটি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ আমার ফেরার সময়ও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত হয় নি। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে এটা আদৌ সম্পাদিত হবে কি না। হানাদার বাহিনীর বিশাল শক্তির বৃহত্তর অংশটি ঢাকার চতুর্দিকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে শেষ যুদ্ধের জন্য তৈরি ছিল। এ লড়াই কত নির্মম, নির্দয় হতে পারে চিন্তা করছিলাম। আত্মবিশ্বাস ছিল যে মুক্তিবাহিনীর ঢাকার শহরে অবস্থান ও তৎপরতার জন্য ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কোনো সংঘর্ষ হতেই পারে না। তবে শত্রুপক্ষ যদি ২৫ মার্চ একাত্তরের ন্যায় প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়, তা হলে ঢাকা অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি সীমাহীন ও অবর্ণনীয় হতে পারে। এই ধারণাটাও নাকচ করে দিয়েছিলাম, কারণ মনোবল ভেঙে পড়া নিশ্চিত পরাজয়ের কথা চিন্তা করে এবং অনিবার্য আত্মসমর্পণের

বিষয়টি স্মরণ রেখে হানাদার বাহিনীর আচরণের অবনতি আর হতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে উদয় হত যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের কথা। তারা কি আমাদের উপকূলে পৌঁছে গিয়েছে? তারা কি আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে? সম্ভবত এসব কারণেই বিচলিত থাকার জন্য ১৬ ডিসেম্বরে আমার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের কথা কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না।

১৬ ডিসেম্বরের দিনটির কথাই লিখতে বসে মনে পড়ে যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ নিশ্চিত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। উৎফুল্ল তো হয়েছিলাম বটে। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল এবং নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। কেন পূর্বেই আঁচ করতে পারি নি যে যুদ্ধ সমাপ্তির পথে। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের ১৪ ডিসেম্বরের মৃত্যুবরণ আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত ও বিষণ্ন করে তুলেছিল।

ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ছিল যে চুপ করে বসে থাকতে পারত না। তার সাব-সেক্টরে প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অ্যাকশন হতেই থাকত। জাহাঙ্গীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ টাউনটি দখল করে নেওয়ার জন্য তৎপর ও উদগ্রীব ছিল। এই অ্যাকশনটিতে যে একটি বড় রকম সংঘাত হবে সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পতন মোহেদীপুর সাব-সেক্টরের একটি গৌরবময় ইতিহাস থেকে যাবে বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীরকে এই অভিযান থেকে বিরত না রেখে সাহায্য করবারই চেষ্টা করেছিলাম। এই সাহায্য দান করাটাই আমাকে ১৬ ডিসেম্বরে মানসিকভাবে পীড়িত করছিল।

১৬ ডিসেম্বরের পরে সেক্টরের সেনা সদস্যদের নতুন অবস্থানে প্রেরণ করার প্ল্যান নেওয়া হয়। লে. কায়সার ও লে. সাইফুল ইসলামের অধীনস্থ মুক্তিবাহিনী সদস্যরা দিনাজপুরে চলে যায়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের অধীনস্থ বাহিনী বগুড়াতে অবস্থান নেয়। মোহেদীপুর ও লালগোলা সাব–সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা মেজর গিয়াসের অধীনে রাজশাহী শহরে ছাউনি ফেলে।

বিজয়ের পরপরই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধার মনোভাব ছিল যে তারা কত তাড়াতাড়ি নিজ নিজ পরিবারের খবরাদি জানতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজেও আমার বাড়ি এবং জ্ঞাতি–গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করছিলাম। বাড়ির অবস্থা কী, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কতজনার কত ক্ষতিসাধন হয়েছে, প্রত্যেকটি ছেলে যে একই কথা ভাববে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ছেলে তাৎক্ষণিক ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টা ছুটির আবেদন করেছিল। মনে হয় তারা নিজ নিজ পরিবারের খবরাদি না নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না। অথচ বাংলাদেশ সরকার বা সেনাপ্রধানের হেডকোয়ার্টার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশাবলি আসে নি।

এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের প্রতিটি অবস্থানে যোদ্ধাদের নিকট থেকে অতি দ্রুত সর্বপ্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা নিয়ে অস্ত্র ভাণ্ডার রক্ষা করা দরকার। সাত নম্বর সেক্টরে প্রায় হাজার চৌদ্দ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। অস্ত্র জমা নেওয়ার

কাজটি একদিনে সম্পন্ন করা কোনো প্রকারে সম্ভব ছিল না। বেশ কয়েক দিন সময় লাগার কথা। যারা জমাকৃত অস্ত্রগুলো যাচাই করে সংগ্রহ করছিল তাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাজশাহীতে দেখেছিলাম যে এরা রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। অন্যদিকে যোদ্ধাদের থেকে প্রবল চাপ ছিল জমাকরণ ব্যবস্থাটি সার্বক্ষণিক খোলা রাখতে। তাদের মানসিক অধীরতার কারণে কে কার আগে অস্ত্র জমা দেবে এই নিয়ে সামান্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছিল। একটি বিষয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম যে এসব ছেলেরা মেনে নিয়েছিল যে অস্ত্র জমা না দিয়ে কেউ ছুটিতে যেতে পারবে না। এই আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সমাজে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিছু অস্ত্রধারী যুবক দেশের বিভিন্ন স্থানে লুটতরাজের লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়ে। এর জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দোষারোপ করা হচ্ছিল। আমি সাত নম্বর সেক্টরের তরফ থেকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমাদের কোনো সদস্যের এ সুযোগ ছিল না। এরা সবাই অস্ত্র জমা দিয়েই বাড়ি ফিরেছিল। আমার অনুমান বাংলাদেশের সমস্ত সেক্টরেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধাদের দোষারোপ করা অতীব অন্যায় হয়েছিল। সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মানুষের বীতশ্রদ্ধ জাগাবার জন্যই এই অপপ্রচার করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্তির দিকে হানাদার বাহিনী অপরিকল্পিতভাবে পশ্চাদপসরণ করছিল। রাজাকার বাহিনীর ওপর তাদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। এই বাহিনীর সদস্যরাও মুক্তিবাহিনীর দ্রুত অগ্রসরের কথা চিন্তা করে তাদের হাতিয়ার ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান খুঁজছিল। সম্ভবত এসব অস্ত্রাদি সমাজের দুষ্কৃতকারীদের হাতে পড়ে, যারা সমাজের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে লুটতরাজে জড়িত হয়ে পড়ে। অথচ মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের প্রতি এই দোষ দেওয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা যে তাদের অস্ত্র সম্ভার জমা দিয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তবে শোনা যায় যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত পলিটিক্যাল কমান্ডোদের অস্ত্র জমা নেওয়া বিলম্বিত হয়েছিল। এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ সমাপ্তির পরপরই সর্বত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের সদস্যদের অস্ত্র কখন, কোথায় জমা হয়েছিল, সে কথা কেবল তারাই জানে।

অস্ত্র জমা দেওয়া সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। রাজশাহী সার্কিট হাউসে সস্ত্রীক ভারতীয় এক মহিলা সাংবাদিক রুচিরা শ্যামের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন সকাল প্রায় ১১টা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মোহেদীপুর সাব-সেক্টরের লে. আউয়াল টেলিফোনে আমাকে জানালেন যে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পান্নুর একদল সেনানী এসে তার ক্যাম্প ঘেরাও করে মুক্তিবাহিনীর জমাকৃত অস্ত্র তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল তার ওপর। লে. সাহেব কেন বাধা দেয় নি এবং অস্ত্র হস্তান্তর করার আগে কেন আমাকে জানায় নি। জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিয়েছিল তাকে এ সুযোগ দেওয়া হয় নি। তাতে আমি আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যাই। তার থেকে পান্নুর টেলিফোন নাম্বার নিয়ে

ব্রিগেড দপ্তরে টেলিফোন করি। ব্রিগেডিয়ার সাহেব ছিলেন না। ব্রিগেড মেজর ছিলেন। তাকে আমি বলি যে সেই দিনই বিকালের মধ্যে আমাদের অস্ত্র যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যথায় তারা যেভাবে আমাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেভাবে আমরা আমাদের অস্ত্র ফিরিয়ে আনব। আমার কথায় কাজ হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম যে ব্রিগেডিয়ার পান্নু এ বিষয়ে কিছু জানত না। এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের অস্ত্রাদি ভারতীয় সম্পদ ছিল। এগুলো আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করি। এগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যাপারেও আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ আমাদের সেনা হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ অনুযায়ী ফেরত দেওয়াটাই উচিত হবে বলে আমি মনে করতাম।

বিভিন্ন সেক্টরে জমাকৃত অস্ত্র কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছিল এবং এগুলো ফিরিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার খোঁজখবর আমি পরে রাখি নি। তবে তখন শোনা গিয়েছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানিদের সমস্ত অস্ত্রসম্ভার, গোলাবারুদ, ট্রাক, ট্যাঙ্ক ও তোপাদি বাংলাদেশ থেকে নিঃশেষ করে নিয়ে গিয়েছিল। এ খবর নিশ্চয় আমাদের সেনা হেডকোয়ার্টার জানত। মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য কোনোরকম নির্দেশ দেয়া হয় নি।

নয় নম্বর সেক্টরের প্রধান মেজর জলিল ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ, দেশপ্রেমিক ও তেজস্বী। তার সেক্টর থেকে যখন ভারতীয়রা মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক, কলকারখানার মালামাল এবং যন্ত্রাংশ নিয়ে যেতে শুরু করে তখন তিনি বাধা দিয়েছিলেন যেমন আমিও এক সময় ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই মোহেদীপুর সাব-সেক্টরে পাট পাচারে বাধা দিয়েছিলাম। তবে জলিলের সাথে এ সংক্রান্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাকে বিপদে পড়তে হয়। পরে শুনতে পাই যে মেজর জলিলকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় আনা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শোনা যায় আমাদের সেনা হেডকোয়ার্টারের নাকি বেশ কিছু অভিযোগ ছিল।

১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে রাজশাহী সার্কিট হাউসে থাকাকালীন সেনা হেডকোয়ার্টার বা আমাদের স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগ থেকে কোনো খবরাদি না পাওয়ার কারণে আমি নিজেই ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে লে. কাইয়ুম, আমার পুত্র নদিম ও কন্যাদ্বয় আমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঢাকায় যাওয়ার তাদের প্রবল ইচ্ছা। আমি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

নগরবাড়ীতে পৌঁছে দেখি ফেরি চলাচলের কোনো নিয়মকানুন ছিল না। ফেরি না পাওয়াতে জিপ পারাপার করার জন্য একটি বড় নৌকা ঠিক করা হয়। এই নৌকার ঘাট অন্যত্র ছিল। সেখানে আমার জিপটিকে তোলার বন্দোবস্ত করছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে ৪-৫টি অস্ত্রধারী ছেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের একজন আমার বুকের ওপর রাইফেল তুলে ধরে। এরকম অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ও আমরা কে তা বুঝাবার চেষ্টা করছিলাম। তাদের অভিযোগ ছিল ভিন্ন। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও ভাব দেখে মনে করেছিল যে আমরা পাকিস্তানি নাগরিক এবং পালিয়ে যাবার উপক্রম করছিলাম। অনেক কষ্টে এবং আওয়ামী লীগের এমপি প্রফেসর আবু সাঈদসহ

(বেড়া, পাবনার প্রতিনিধি) অনেকের নাম নেওয়াতে তারা ক্ষান্ত হয়। বুঝতে পারলাম এই অস্ত্রধারীরা ৭নং সেক্টরের সদস্য ছিল না। তারা অন্য কোনো বাহিনীর পক্ষে কাজ করছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে আলোচনা করার তেমন সুযোগ ছিল না। আমি তাদের তেমন চিনতাম না এবং তারাও আমাকে যথেষ্ট সমীহ করত। তবে আলোচনা যে আদৌ হয় নি তা নয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দেশগড়া এবং ভারতের অভিপ্রায় নিয়ে। দেশের অভ্যন্তরের লোকেরাও ভারতের কর্তৃত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিল। এটা স্বাভাবিক। দেশের ভেতরে প্রগতিশীলরা কতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কি নীতিমালা অনুসরণ করছিল, তা আমার জানা ছিল না। মনে এই বিশ্বাসটুকু ছিল যে ভারতীয় সরকার যদি আমাদের পরাধীন রাখার কোনো পরিকল্পনা নেয়, তার বিরোধিতা করার জন্য দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধে সংগ্রামীদের অভাব হবে না। তবে কখনো ভাবি নি যে এই অস্ত্র আমার নিজের ওপরই প্রয়োগ করা হবে।

ঢাকায় স্বল্পদিনই ছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনীর হেডকোয়ার্টার সম্ভবত ভারতীয় বাহিনীর দখলে ছিল। ওসমানীর সদর দপ্তর সম্ভবত 'লগ এরিয়া' কমান্ডারের দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছিল। এখানে আমি দুএকদিন যাওয়া-আসা করি। কিন্তু বিশেষ কোনো কর্তৃপক্ষকে অফিসে দেখতে পাই নি। জেনারেল ওসমানীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ব্যস্ততার কারণে আমাকে সময় দিতে পারেন নি। এখানে একটি বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হই। বিমান বাহিনীর তোয়াবকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদবি নিয়ে এবং উর্দি পরে ব্যস্ততায় থাকতে দেখি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শুনেছিলাম যে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাকে কী দায়িত্ব দেয়া হবে এবং কোন পদে বহাল করা হবে সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যাই হোক কোনো-না-কোনো কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু বিজয়ের পরপরই তিনি কী করে ওসমানীর হেডকোয়ার্টারে স্থান পেলেন বুঝতে পারি নি।

ওসমানীর হেডকোয়ার্টার বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এসব দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে অতিসত্বর রাজশাহীতে ফিরে গিয়ে আমার দায়িত্ব মেজর গিয়াসকে বুঝিয়ে দিয়ে মুক্তি ফৌজ থেকে অবসর নেব।

রাজশাহীতে ফিরে গিয়ে উপরোক্ত কাজই করছিলাম। এসময়ে ওসমানীর কাছ থেকে আমার জন্য 'অভস ইমিডিয়েট' মাত্রায় জরুরি চিঠি আসে। কেবল লেখা ছিল তার সাথে দেখা করতে। এ মাত্রায় সচরাচর জরুরি চিঠি দেওয়া হয় না। ভাবলাম সত্যি হয়তো কোনো জরুরি বিষয় নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে চান। তৎকালীন হেডকোয়ার্টারের অবস্থা ও ওসমানীর আচরণের কথা মনে রেখে আমি দুদিন পরে ঢাকা

আসি। তবে ঢাকাতে সাত দিন অবস্থান নিয়েও জেনারেলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় আমি হেডকোয়ার্টার থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিই। মুক্তিযুদ্ধে আমি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলাম এবং স্বেচ্ছায় বিদায় নিই।

সংযোজন–১

হামজাপুর সাব–সেক্টরে নভেম্বর–ডিসেম্বরের দিকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এই সাব–সেক্টর যদিও স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তবুও এখানে দৈনন্দিন সংঘর্ষ চলত ইদ্রিসের বাহিনীর সাথে। ইদ্রিস ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। চুপ করে বসে থাকার মতো অফিসার ছিল না। এ কারণে আমরা কিছু ফলও পেয়েছিলাম। যেমন ১৬ ডিসেম্বরের দু–তিন দিন আগে দিনাজপুর শহর থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলাম। ইদ্রিসের কাছে অফিসারের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সেই কারণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েক জন অফিসারকে আমার সেক্টরে যখন পোস্টিং দেওয়া হয়, তাদের থেকে আমি দুজনকে হামজাপুরে পাঠিয়ে দেই। এরা ছিল লে. সাইফ–উল–ইসলাম এবং লে. কায়সার। এরা দুজনই সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিল। এখানে একটি অ্যাকশনে সাইফ–উল–ইসলাম আহত হয়। এ খবর আমার কাছে পৌঁছতে সময় লাগে। অনুসন্ধান করে জানতে পারি সাইফকে দিনাজপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালটি আমার হেডকোয়ার্টার তরঙ্গপুর থেকে দূরে ছিল না। তবুও এই আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমার অন্যান্য ব্যস্ততার জন্য সাইফকে দেখতে যাওয়ার সময় করে উঠতে দেরি হয়ে যায়।

দিনাজপুর আর্মি হাসপাতালে পৌঁছে অফিসার ওয়ার্ডে গিয়ে সাইফের কোনো সন্ধান পেলাম না। কর্মরত ডাক্তারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, সাইফ নাকি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। ডাক্তাররা আমাকে কমান্ডারের সাথে দেখা করতে পরামর্শ দেন। কর্নেলের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই তিনি অভিযোগ তুললেন যে মুক্তিবাহিনী অফিসারদের মধ্যে ডিসিপ্লিন নাই। তার কথার ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন যে, সাইফ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে। তার জীবনে নাকি এরকম ঘটনা ঘটে নাই।

ঘটনাটি শুনে আমি বিস্মিত হই। সাইফ আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিহার করে এবং ভীত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো মানুষ নয়। আমি আর দেরি না করে দুএক দিনের মধ্যেই হামজাপুরে উপস্থিত হই। সেখানে গিয়ে সাইফকে ব্যান্ডেজ পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। তার একটি হাত ঝুলানো রয়েছে। সে আমাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল এবং তার বিরুদ্ধে হাসপাতালের অভিযোগ শুনে বেশ হাসল।

বলল সব সাব-সেক্টরে ঘোরতর সংঘর্ষের মধ্যে যেখানে অফিসারের সংখ্যা নেহায়েত কম, তার পক্ষে হাসপাতালে বিশ্রাম নেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না। ডাক্তারের কাছে হাসপাতাল ত্যাগ করার অনুমতি না পেয়ে সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সামান্য একটা গুলি লাগাতে হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকতে তার মন চায় নি। তাই সে পালাতে বাধ্য হয়।

সংযোজন-২
(জুন-জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধ ধীরগতিতে চলছিল)

মুক্তিযুদ্ধ বলতে অনেকে স্থলবাহিনীর কথা চিন্তা করেন। আমাদের কিন্তু একটি নৌ-কমান্ডও ছিল এবং যুদ্ধ শেষের কয়েক মাস আগে বিমান বাহিনীর শাখাও খোলা হয়েছিল। এই দুই শাখার মধ্যে নৌ-কমান্ডই ছিল বৃহত্তর, এই বাহিনীর সদস্যদের ভারতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যার তুলনায় এই কমান্ডের মুক্তিযুদ্ধে অবদান ছিল অসীম। এদের সাহসিকতা ও বীরত্বকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি বলে আমি মনে করি।

আমাদের স্থলবাহিনীর অপারেশনে যখন কিছুটা ভাটা পড়ে নৌ-কমান্ড তখন তাদের তৎপরতার পরিচয় দেয়। প্রধানত এরা ছিল ডুবুরি এবং বিস্ফোরক সম্বন্ধে এদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। শুনেছি এরা অনেকেই সাঁতারও জানত না এবং বিস্ফোরক কোনোদিন চোখেই দেখে নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব দামাল ছেলেরা সম্ভবত '৭১-এর ১৪-১৫ আগস্টে নির্ধারিত একই সময় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং সম্ভবত সিরাজগঞ্জ ঘাটে অ্যাকশন চালায়। যার ফলে বন্দর দুটি প্রায় অচল হয়ে পড়ে এবং ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই অ্যাকশনে ডজনখানেক সমুদ্রবাহী জাহাজ ও যাত্রীবাহী স্টিমার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকটি ডুবেও যায়। এই সুপরিকল্পিত অ্যাকশন দেশব্যাপী একই দিনে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হওয়ায় ঢাকাস্থ হানাদার বাহিনীর হাই কমান্ড ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর প্রভাব ইসলামাবাদের ওপরও যথেষ্ট পড়েছিল বলে পরবর্তীকালে শোনা যায়। দেশ ও জাতিকে বাঙালি নৌ-কমান্ডের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য বেশ কিছু ফ্যাক্টরের দিকে নজর রাখতে হয়। যেমন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মান, সৈন্যের ব্যবহৃত অস্ত্রাদি, উপযোগিতা এবং উৎকৃষ্টতা, রণাঙ্গনে অবস্থানরত সৈনিকদের রসদ সরবরাহ এবং সৈনিকদের মনোবল। উচ্চ মনোবলসম্পন্ন বাহিনী অনেক দুরবস্থা কাটিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমাদের দেশের বাহিনী ছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আর হানাদার বাহিনী লড়াই করছিল পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামাবাদের অধীনে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। লক্ষ্যটি হানাদার বাহিনীর সদস্যদের অনেকেরই বোধগম্য ছিল না। মুসলমান হিসেবে আমরা ছিলাম পাকিস্তানিদের চেয়েও শ্রেয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি বিমান ভারতের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কলম্বো হয়ে ঘুরে আসতে হত। তা ছাড়া বিমান পরিবহন দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে রসদ প্রেরণ করাও ছিল দুরূহ। বাণিজ্যিক জাহাজই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারত। ১৪-১৫ আগস্টে নৌ-কমান্ডের অ্যাকশনের দরুন পূর্ব পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর হাইকমান্ড উপলব্ধি করে যে, এই ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতে বহুলাংশে ব্যাহত হতে পারে। তারা আরো উপলব্ধি করে যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এ কারণে তাদের মনোবলে প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা নৌ-কমান্ডদের অ্যাকশন যুদ্ধ-বিজয়ে ব্যাপকতরভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সংযোজন-৩
(ওসমানী কর্তৃক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্স নির্দেশাবলি)

এই কনফারেন্সে ওসমানী সাহেব প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারকে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিখে তার কাছে পেশ করতে নির্দেশ দেন। আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় দেওয়া হয়েছিল। লেখা শেষে আমাদের এক এক করে ডাক পড়ে। পরিকল্পনায় যারা তাদের অঞ্চলের ব্রিজগুলো Destroy করবে বলে লিখেছিল তাদেরকে তিনি পরামর্শ দেন Demolish করার জন্য। আর যারা Demolish লিখেছিল তাদেরকে বলেন Destroy করার জন্য। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে একটু হাসি-ঠাট্টা চলছিল। সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে মেজর জলিল ছিল সবচেয়ে নবীন ও আবেগপ্রবণ। ওসমানী সাহেব তাকে ব্রিজ সংক্রান্ত শব্দটি পরিবর্তন করতে বলায় সে জেনারেল সাহেবকে জানায় যে, আমাদের কনফারেন্সটা ইংরেজি শিক্ষার আসর করে তোলার প্রয়োজন নাই। জলিল ফিরে এসেই আমাদের সকলের কাছে বেশ উত্তেজিতভাবে এবং উচ্চ স্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে। আমরা কয়েকজন তাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ধীর ও শান্ত হতে বলি। কারণ পরিস্থিতিটা অপ্রীতিকর হয়ে উঠছিল।